সম্পূর্ণ উপন্যাস

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

# ময়ূরবাড়ির রহস্য

## সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ফোন কলটা এসেছিল গতকাল রাতে। বাবা, মা, ঝিনুক, দীপকাকু তখন সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের এক চিনা রেস্তরাঁয়। সদ্য একটা তদন্তে সাফল্য পেয়ে ঝিনুকদের খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন দীপকাকু। এসে গেল আর-একটা ইনভেস্টিগেশনের ডাক। ভদ্রলোক আসানসোল থেকে ফোন করেছেন। নাম মোহিতলাল রায়। জরুরি ভিত্তিতে দীপকাকুর

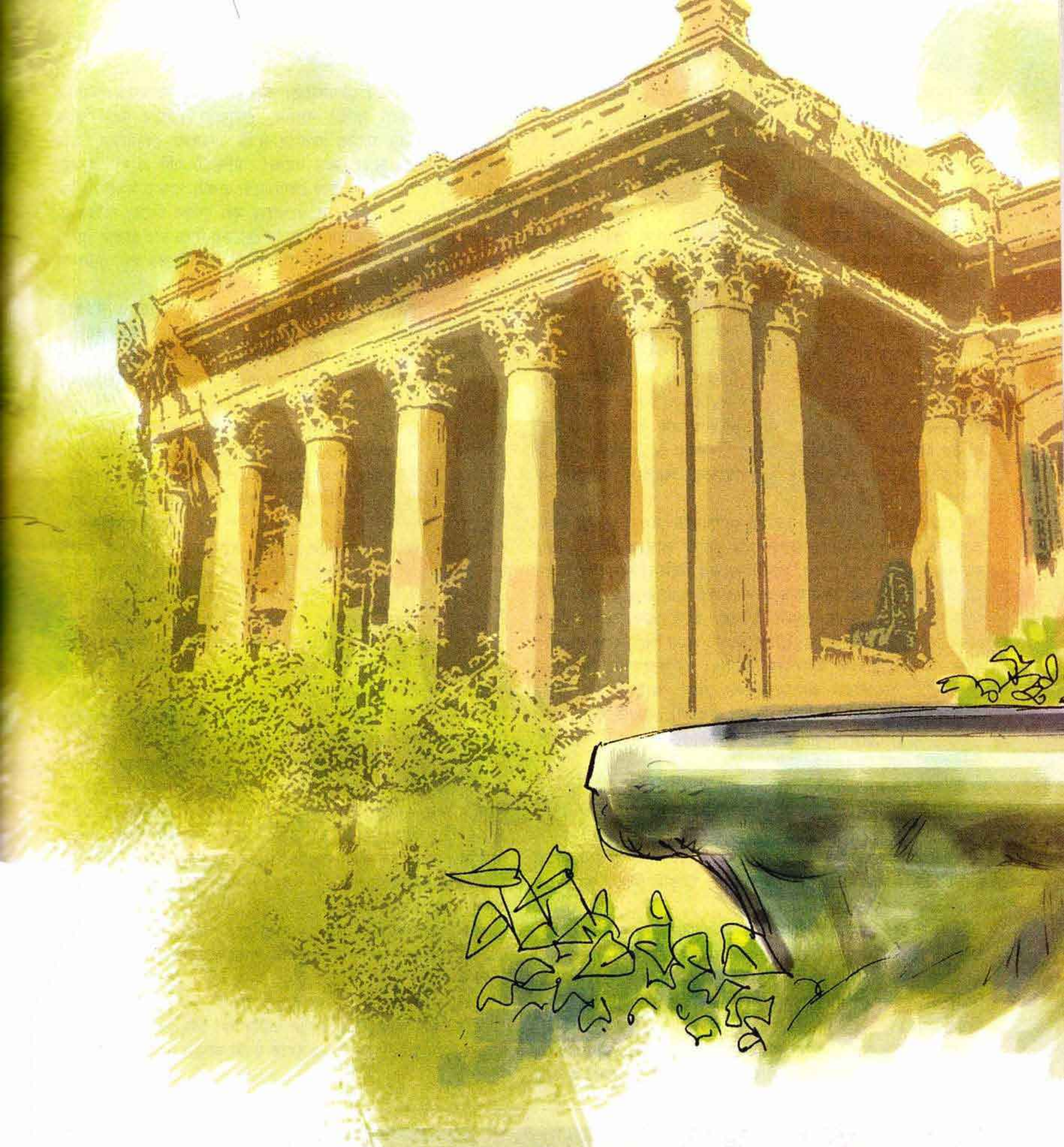

সাহায্য চান। সমস্যাটা ফোনে বলতে চাননি। আসানসোলে ওঁর বাড়িতে গিয়ে শুনতে হবে। দীপকাকুর খোঁজ পেয়েছেন টিভি সিরিয়ালের ডিরেক্টর সুমিতাভ বসুর থেকে। ওঁর ভাগনে হন সুমিতাভবাবু। স্ক্রিপ্টরাইটার অনল সেনগুপ্ত খুনের কেসে দীপকাকু যে অসম্ভব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, সুমিতাভবাবু তার সবিশেষ বর্ণনা মামাকে দেন। সঙ্গে দিয়েছিলেন দীপকাকুর ফোন নম্বর। যদি কখনও কাজে লাগে। সুমিতাভবাবু এখন শুটিংয়ের কাজে ব্যাঙ্ককে। তাই ভাগনেকে দিয়ে কথা না বলাতে পেরে নিজেই ফোন করেছেন মোহিতবাবু।

দীর্ঘ ফোনালাপের পর বাবাকে ফোনের অপর প্রান্তের সমস্ত কথা জানিয়েছিলেন দীপকাকু। বাবা বলেছিলেন, "তুমি এই কেসটায় ঝিনুককে সঙ্গে নিয়ে যাও। অনেকদিন অ্যাসিস্ট করেনি তোমাকে। স্কিল নষ্ট হয়ে যাবে। ওর কলেজে এখন ক্লাসও হচ্ছে না তেমন।"

বাবা এক্স-মিলিটারিম্যান। এখন সিকিওরিটি এজেন্সির মালিক। ঝিনুকের ডিটেকটিভ হয়ে ওঠার ইচ্ছে সাপোর্ট করেন। মা আগে করতেন না, এখন মেনে নিয়েছেন। আজ ভোরে হাওড়া স্টেশন থেকে ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস ধরে দীপকাকু ঝিনুককে নিয়ে চলে এসেছেন আসানসোলে। এখন অটোরিকশা চেপে যাওয়া হচ্ছে উষাগ্রাম, ময়ূরবাড়ি। ঠিকানা মোহিতবাবুর দেওয়া। উষাগ্রাম কোনও গ্রামাঞ্চল নয়। আসানসোলের একটা প্রান্ত। মিনিটপাঁচেক হতে চলল

ঝিনুকদের অটোরিকশা জার্নি। আশপাশে গ্রামের লক্ষণ দেখা না দিলেও, জায়গাটা ক্রমশ ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে আসছে। মেন রাস্তাটাও বেশ চওড়া। এটা জি টি রোড, খানিক আগে দীপকাকুর থেকে জেনেছে ঝিনুক। চলন্ত অটোর ঝোড়ো হাওয়ায় শীত-শীত ভাব। বেলা অথচ সাড়ে দশটা। কালীপুজো, ভাইফোঁটা পার হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় শীতের নামগন্ধ নেই।

ভোরের দিকে একটু ঠান্ডা ভাব থাকে। এখানে তো মনে হচ্ছে সকাল-সন্ধে পাতলা র‍্যাপারের মতো কিছু লাগবে। এই অ্যাসাইনমেন্টে ব্যাগে তিন-চারদিনের জামাকাপড় নিয়েছে ঝিনুকরা। আসল কাজটা না বললেও, কিছু নির্দেশসমেত তদন্তের প্রাথমিক সময়টার আন্দাজ দিয়েছেন মোহিতবাবু। দীপকাকুকে বলেছেন, "আপনার বোধ হয় কয়েকদিন সময় হাতে নিয়ে এখানে আসা ঠিক হবে।"

সেই মতো দু'জনের ছোট দু'টো লাগেজ হয়েছে। দীপকাকু শীতবস্ত্র কিছু নিয়েছেন কি না, জানে না ঝিনুক। তাকে অন্তত নিতে বলেননি। যেটা অতি অবশ্যই নিতে বলেছিলেন, ভিডিও ক্যামেরা। বাড়ির হ্যান্ডিক্যামটা নিয়েছে ঝিনুক। দীপকাকু ভোর পাঁচটায় ট্যাক্সি সমেত বাড়িতে যখন নিতে এসেছিলেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ক্যামেরাটা নিয়েছ তো?"

ঘাড় হেলিয়েছিল ঝিনুক। ভিডিও ক্যামেরাটা নেওয়া হয়েছে একটা অজুহাত হিসেবে। ইনভেস্টিগেশনের কাজে লাগবে বলে নেওয়া হয়নি। লাগতেও তো পারে, যথেষ্ট কাজের জিনিস। ঝিনুক তাই গত রাতে ক্যামেরা অপারেশনটা ভাল করে ঝালিয়ে নিয়েছে। কেসটা না জানা পর্যন্ত অস্বস্তিকর একটা উৎকণ্ঠা হচ্ছে তার। অপর দিকে দীপকাকু রয়েছেন নির্বিকার। ট্রেনে আসার সময় সিটে বসে ল্যাপটপ খুলে আসানসোলের ম্যাপ দেখছিলেন। ইনফরমেশন নিচ্ছিলেন কোলিয়ারি বেল্টের। আসানসোলে নেমে অটোস্ট্যান্ডে গিয়ে ময়ূরবাড়ির নাম বলতেই চিনে ফেলল সকলে। বোঝাই যাচ্ছে বেশ ফেমাস বাড়ি। ট্রেনে ঝিনুক একবার দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করেছিল, "ময়ূরবাড়ি নাম কেন?"

"বোধ হয় ময়ূর পুষত," বলেছিলেন দীপকাকু।

ঝিনুক বলেছিল, "পুষত কেন! হয়তো এখনও আছে।"

"থাকতেই পারে। সরকারিভাবে ময়ূর পোষা মানা।"

মেন রোড ছেড়ে বাঁ দিকে ঢালু মোরামের লাল রাস্তায় নামল অটোরিকশা। সামান্য গিয়েই থেমে গেল ঝাঁকুনি দিয়ে। অটোওলা বলল, "ময়ূরবাড়ি এসে গিয়েছে।"

নেমে এল ঝিনুক। দীপকাকু ভাড়া মেটাচ্ছেন। বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অটো। একটা আন্দাজ মেলেনি দীপকাকুর। এঁরা ময়ূর পুষতেন না। গেটের উঁচু দুই থামের উপর মুখোমুখি দু'টো সিমেন্টের ময়ূর। বেশিরভাগ পুরনো বাড়ির 'সিংহদরজা' হয়, এঁদের 'ময়ূরদরজা'।

লোহার রড দেওয়া পাল্লা দু'টো মোটা শিকল দিয়ে বাঁধা। মাঝে একটা মানুষ যাতায়াতের মতো ফাঁক। ঝিনুক, দীপকাকু এক-এক করে ঢুকে পড়লেন বাড়ির চৌহদ্দিতে। অনেকটা জায়গার মাঝে জমিদার আমলের দোতলা বাড়ি। বাগান, ফোয়ারা (দেখে মনে হচ্ছে অকেজো), ছোট মাঠের ওপারে দু'টি একতলা কোয়ার্টার, তার পিছনে মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। মন্দিরটি যদি এ বাড়ির হয়, এলাকা যা দাঁড়াল কলকাতার ছোটখাটো একটা পাড়ার সমান। নুড়ি-বিছানো রাস্তা ধরে ঝিনুকরা এগোচ্ছে মূল বাড়ির দিকে, বাড়ির বাঁ পাশে পাঁচিল সংলগ্ন অ্যাসবেসটসের শেডের নীচে চার চাকার গাড়ি। সেদিকে তাকিয়ে ঝিনুক দীপকাকুকে বলে, "আমাদের জন্য স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারত। গাড়ি বসে রয়েছে।"

"তুমি কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, আমরা ছদ্ম পরিচয় নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকছি। যেন নিজেদের দরকারে আসা। এঁরা গাড়ি পাঠাবেন কেন?"

দীপকাকুর কথায় মনে-মনে জিভ কাটে ঝিনুক। দীপকাকুকে অন্য পরিচয়ে আসতে মোহিতবাবুই বলেছেন। গোয়েন্দার শরণাপন্ন হয়েছেন, ব্যাপারটা আশপাশের লোক জানুক, উনি চান না। ঝিনুকরা এখানে এসেছে ফিল্ম প্রোডাকশনের লোক হয়ে। দীপকাকু প্রোডাকশন ম্যানেজার, ঝিনুক অ্যাসিস্ট্যান্ট। একটি সিনেমার শুটিংয়ের জন্য দীপকাকু ময়ূরবাড়িটা দেখে সিলেক্ট করতে এসেছেন। দীপকাকুর আর-একটা পরিচয়, এই পরিবারের নিকট আত্মীয় সুমিতাভ বসুর বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে এ বাড়ির বর্ণনা শুনে দীপকাকু এখানে আসার কথা ভেবেছেন। আগামী ছবিটিতে একান্ত প্রয়োজন এ ধরনের একটি বাড়ির। সেই ছবির ডিরেক্টর সুমিতাভ বসু নন, অরণ্য সেন। ইয়ং ডিরেক্টর। সম্প্রতি একটি সিনেমায় খুব নাম হয়েছে। তাঁর হয়ে দীপকাকু এসেছেন এ বাড়ির সুবিধে-অসুবিধে বুঝে মালিকের সঙ্গে কথা বলতে, শুটিং করতে দিতে রাজি হলে বাড়ির ভিতর-বাইরের ফোটো তুলে অরণ্য সেনকে দেখাবেন। সে কারণেই ভিডিও ক্যামেরাটা আনা। ঝিনুকদের আগমনের হেতুর এই বোঝাপড়াটা মোহিতবাবুর সঙ্গে ফোনালাপের সময়ই হয়ে রয়েছে দীপকাকুর। ঝিনুককেও তাই নিজের নতুন পরিচয়টা সব সময় মনে রাখতে হবে।

মূল বাড়ির পোর্টিকোর তলায় চলে এসেছে ঝিনুকরা। সামনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি, বারান্দা, খোলা সদর দরজা। দীপকাকু সিঁড়িতে পা দিতে যাবেন, দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন বছর পঞ্চান্ন-ষাটের একটি লোক, উঁচু করে পরা ধুতি, হাওয়াই চটি, শার্টের কলার দেওয়া পাঞ্জাবি। মাথার চুল কাঁচা-পাকা। জানতে চাইলেন, "কাকে চাই?"

"মোহিতবাবুর সঙ্গে দেখা করব। ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া আছে," বললেন দীপকাকু।

ভদ্রলোক বললেন, "ফোনে কথা হয়ে আছে। তা হলে আসুন। বৈঠকখানায় বসুন। বাবু উপরতলায়, খবর পাঠাচ্ছি। আপনার নামটা একটু বলবেন?"

"বলুন, সুমিতাভর বন্ধু, তা হলেই হবে।"

ঘুরে গিয়ে দরজা পার হলেন ভদ্রলোক। ঝিনুকরা সিঁড়িতে উঠে পড়েছে। মানুষটি পিছন ফিরে বসার ঘরটা আঙুল তুলে নির্দেশ করে দিলেন।

মিনিটপাঁচেক হতে চলল ঝিনুকরা বসে আছে। মোহিতবাবু এখনও নামেননি। ধুতিপরা লোকটি এসে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, "বাবু আসছেন। বসুন একটু।"

ঝিনুকের ধারণা মোহিতবাবু ইচ্ছাকৃতভাবেই দেরি করছেন নীচে নামতে। নিজের ব্যগ্রতা আড়াল করতে চাইছেন বাড়ির অন্য লোকেদের কাছে। বাড়িতে অবশ্য লোকজনের আওয়াজ তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। নিঝুম বাড়ি। বাইরে থেকে পাখির ডাক ভেসে আসছে মাঝে-মাঝে। 'বৈঠকখানা' শব্দটা এ ঘরের ক্ষেত্রে একেবারে যথার্থ। বসার ঘর বা ড্রয়িংরুম বলা যাবে না। উঁচু লম্বাটে দরজা-জানলা। কড়িবরগা দেওয়া ছাদ থেকে নেমে এসেছে ইংরেজ আমলের চার ব্লেডের ফ্যান। কালো বার্নিশ করা কাঠের সমস্ত আসবাবপত্র। গ্র্যান্ডফাদার ক্লক, পেন্টিং, মেঝেতে-টেবিলে রাখা ছোট-বড় ফ্লাওয়ার ভাস, বিভিন্ন শো পিস। ফ্লোরটা দাবার বোর্ডের মতো! সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে ঝিনুক দীপকাকুর উদ্দেশে বলল, "বাড়িতে তো অনেক কিছু আছে, রীতিমতো অ্যান্টিক ভ্যালুর। বেশ পয়সাওলা লোক! অথচ বাড়ির মেন গেট, সদর দরজায় কোনও পাহারা নেই। সব খোলা পড়ে রয়েছে।"

দীপকাকু উত্তর দিতে যাবেন, দরজা দিয়ে যিনি ঢুকলেন, বলে না দিলেও চলবে, মোহিতলাল রায়। বয়স আন্দাজ পঁচাত্তর। লম্বা অভিজাত চেহারা। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। চশমা। পুরুষ্টু গোঁফ, মাথার চুল পুরোটাই সাদা। ওঁকে দেখে সোফা ছেড়ে উঠে দীপকাকু হাতজোড় করলেন। ঝিনুকও উঠে দাঁড়িয়েছে। উনি প্রতি নমস্কারের সৌজন্যে না গিয়ে ঝিনুকদের একবার দেখে নিয়ে সিলিংয়ের দিকে চোখ তুলে হাঁক পাড়লেন, "শশাঙ্ক, এঁদের বসিয়েছ, ফ্যানটা ছেড়ে দাওনি?"

এক লাফে ঘরে ঢুকলেন ধুতি পরা লোকটি, যিনি রিসিভ করেছিলেন ঝিনুকদের। দীপকাকু বলছেন, "ফ্যানের কোনও দরকার নেই। গরম লাগছে না।"

দীপকাকুর কথা কানে নিলেন না শশাঙ্কবাবু, ফ্যানের সুইচ অন করে দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। বোঝাই যাচ্ছে মনিবের আশপাশে থাকা অনুগত মানুষ। মোহিতবাবু এসে বসলেন সিঙ্গল সোফায়। ঝিনুকরাও বসে। কথা শুরু করেন মোহিতবাবু, "তোমাদের শুটিং ক'দিনের?"

"পনেরো থেকে কুড়ি দিনের মধ্যে হয়ে যাবে, আশা করছি," বললেন দীপকাকু।

গটআপ কথাবার্তা চলছে। ঘনিষ্ঠ সহচর শশাঙ্কবাবুকেও মোহিতবাবু জানতে দিতে চাইছেন না দীপকাকুর আগমনের হেতু। বোঝা যাচ্ছে, কেসটা একেবারেই সিক্রেট। বাইরে সজোরে কোনও মোটরবাইক এসে থামল। মোহিতবাবু বলছেন, "দ্যাখো, সব ঘর তো শুটিংয়ের জন্য ছাড়তে পারব না, মানে যেগুলোয় থাকি আমরা। ফাঁকা ঘর বেশ ক'টা আছে, সাফসুতরো করে নিতে হবে। আমার ঘরটা অবশ্য ব্যবহার করতে পার। সাজানো, গোছানো আছে। আমি একাই থাকি। ক'টা দিন না হয় অন্য ঘরে শিফট করে যাব।"

কথা শেষ হতেই ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল বছর বাইশ-তেইশের ছেলে। চেহারায় মোহিতবাবুর ছাপ। মোহিতবাবুর চোখ-মুখে স্নেহ ফুটে উঠল। ছেলেটিকে দেখিয়ে দীপকাকুকে বললেন, "আমার নাতি। সুবর্ণ।"

মাথা নাড়িয়ে দীপকাকু সম্ভাষণ জানালেন। সুবর্ণর থেকে কোনও প্রত্যুত্তর এল না। ঝিনুকদের দেখিয়ে মোহিতবাবু নাতিকে বললেন, "সিনেমার শুটিংয়ের জন্য বাড়িটা ব্যবহার করতে চায়। সুমিতাভর বন্ধু।"

এতেও কোনও ভাব-বিকার দেখা গেল না ছেলেটির। শুধু ভ্রু জোড়া একবার কাছাকাছি এসে স্বস্থানে ফিরে গেল। কোনও জরুরি দরকারে দাদুর কাছে এসেছে, সেটাই বলে ওঠে, "জগুদার লরি গ্যারাজে। ই সি এল-এ ডেলিভারিটা কী করে দেব?"

"অন্য লরি ভাড়া কর। ভাড়া বেশি লাগে, দিতে হবে। ডেলিভারি টাইম ফেল করলে চলবে না।"

দাদুর নির্দেশ শুনে মুহূর্তের মধ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সুবর্ণ। মোহিতবাবু আবার আগের মুডে এসে দীপকাকুকে বললেন, "আমার ঘরটা যখন দেখবে, চলো উপরে বসেই কথা বলি।"

সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন মোহিতবাবু। শশাঙ্কবাবুর দিকে ঘুরে বললেন, "তুমিও একটু ডেলিভারির ব্যাপারটা দ্যাখো। আজই যেন হয়ে যায়। আমি এদের উপরটা দেখিয়ে আনি।"

ঘাড় হেলিয়ে ঘর ছাড়লেন শশাঙ্কবাবু। মোহিতবাবু দরজার দিকে এগোলেন। অনুসরণ করল ঝিনুকরা।

দোতলার একদম সামনের ঘরটা মোহিতবাবুর। ঘরটার জন্য আলাদা করে সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া আছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পর একফালি ঘেরা বারান্দা, যার একধারে সারি দিয়ে ঘর। তিনটে দরজা পেরনোর পর তালা মারা গ্রিলের গেট। তালা খুলে ঝিনুকদের নিয়ে ঢুকে গেটের হুড়কো টেনে দিয়েছেন মোহিতবাবু। তারপর নিয়ে এসেছেন নিজের ঘরে। এই ঘরটাও পুরনো আসবাবে সুসজ্জিত। সময় যেন হঠাৎ একশো বছর পিছিয়ে গিয়েছে। দেওয়াল ক্যালেন্ডারটা শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছে, এটা কত সাল। কারুকাজ করা পুরনো পালঙ্ক। ঝালর দেওয়া মাথার বালিশ, পাশবালিশের কভার। ঘরের কোণে টেবিলের উপর চোঙাওলা গ্রামাফোন, কাঠের দু'টো ঢাউস আলমারি। বইয়ের আলমারির সামনে কাচ। মোহিতবাবু পালঙ্কের কোণের দিকে দাঁড়িয়ে সিন্দুক খুলছেন। ঘরে ঢুকেই ঝিনুকের চোখ আটকেছিল জাহাজের স্টিয়ারিংয়ের মতো হাতল দেওয়া সিন্দুকটার উপর। ব্যবসায়ী পরিবার, অনেক টাকার লেনদেন হয়, এ ধরনের একটা মজবুত চেস্ট এ বাড়িতে থাকা স্বাভাবিক। মোহিতবাবু ওখান থেকে কী বের করতে গেলেন, এখনও জানাননি। ঝিনুকরা বসে আছে পালঙ্কের দিকে মুখ করা পাশাপাশি দু'টি চেয়ারে। সামনে হাঁটুর উচ্চতায় একটা টেবিল। ফ্লোরের মাঝের অংশে কার্পেট, যার উপর এসে পড়েছে দরজা-জানলার উপর লাগানো আর্চ করা রঙিন কাচের আলো।

সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে মোহিতবাবু এগিয়ে আসছেন। ডান হাতে লাল শালুতে মোড়া কিছু একটা! টেবিলে এনে রাখলেন। কাপড় সরিয়ে দিতে দেখা গেল, সোনার মুকুট! দেবী প্রতিমার মাথায় যেমন থাকে। লম্বায় পাঁচ-ছ' ইঞ্চি, উচ্চতা আড়াই থেকে তিন ইঞ্চি। মুকুটের কারুকাজের সঙ্গে লাল, নীল, সবুজ পাথরও আছে। মোহিতবাবু বললেন, "এটা নিয়েই কেস।"

বিস্ময় এবং প্রশ্ন মেশানো দৃষ্টিসহ দীপকাকু মুকুট ও মোহিতবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। খানিক দূরে থাকা একটা মোড়া টেনে নিয়ে ঝিনুকদের মুখোমুখি বসলেন মোহিতবাবু। দীপকাকুর উদ্দেশে বললেন, "এটা হাতে নিয়ে দেখে বলুন তো আসল না নকল?"

মুকুটটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন দীপকাকু। তালুর উপর রেখে হাত অল্প উপর-নিচ করলেন। ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করছেন বোধ হয়। হাই পাওয়ারের চশমাওলা চোখের কাছে নিয়ে এসে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর দেখলেন। তারপর অবধারিত ভাবে লাগেজ ব্যাগের সামনের চেন টেনে বার করলেন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস। সঙ্গে ব্যাগ আছে বলে আতশকাচটা ওখানে পাওয়া গেল, নয়তো ইনভেস্টিগেশনের টুকিটাকি সরঞ্জাম দীপকাকুর প্যান্টের পকেটে থাকে।

আতশকাচের সাহায্যে মুকুটটা আরও খুঁটিয়ে দেখে দীপকাকু মুকুটটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, "এটা সোনার নয়। নকলটা বানানো হয়েছে বেশ ভাল। সোনা বলে ভুল হতেই পারে।"

"হুম," বলে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন মোহিতবাবু। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "সোনা যে নয়, কীভাবে বুঝলেন?"

"অবশ্যই আন্দাজ করে। তবে তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় একশো শতাংশ।"

"সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পয়েন্টগুলো শুনি।"

মোহিতবাবুর কথার উত্তরে দীপকাকু বলতে শুরু করলেন,

"প্রথমত, এটা সোনার হলে ওজনে আরও হালকা হত। তারপর এর কারুকাজ, মানে তার এবং কাটিংয়ের কাজ সূক্ষ্ম হত অনেক। পাথরগুলোও সম্ভবত নকল, রঙের ঘনত্ব, উজ্জ্বলতা কম। আর সব চেয়ে বড় লক্ষণ, মুকুটের পিছন দিকে নিকেলটা যত্ন করে পালিশ করা হয়নি। ওই অংশ যেহেতু সহজে চোখে পড়ে না, নকল করার সময় গুরুত্ব দেয় না কারিগর।"

থামলেন দীপকাকু। কৌতূহল চাপতে না পেরে মুকুটটা হাতে তুলে নিয়েছে ঝিনুক। পয়েন্টগুলো শোনার পরও মনে হচ্ছে এটা সোনারই। এত নিখুঁত তৈরি করেছে! ফের দীপকাকু বলে উঠলেন, "আর একটা ব্যাপার অ্যাড করি, এটা সোনা কিনা জানার জন্য আপনি কোনও স্বর্ণকারের কাছে গিয়েছিলেন। অথবা নিজেই কষ্ঠিপাথর ঘষে পরীক্ষা করেছেন। মুকুটের এক জায়গায় সামান্য স্ক্র্যাচের দাগ রয়েছে। ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ছাড়া সেটা দেখা যাবে না।"

বড় করে শ্বাস ছেড়ে (নিশ্চয়ই স্বস্তির) মোহিতবাবু বললেন, "যাক বাবা, আমি নিশ্চিন্ত। তদন্ত করতে সঠিক লোককেই ডেকে পাঠিয়েছি।"

"এবার কী কারণে ডেকেছেন, সেটা বলুন। সবচেয়ে প্রথমে জানতে চাইব, জিনিসটা সোনার নয় জেনেও সিন্দুকে এত সুরক্ষিত করে রেখেছেন কেন?"

"অত্যন্ত বিচক্ষণের মতো প্রশ্ন। কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছিলাম না। ঘটনাটা বলতে এবার সুবিধে হবে," বলে দম নিয়ে নিলেন মোহিতবাবু। তারপর শুরু করলেন বলতে, "এটা যে নকল, জানি আমি আর জানে এখানকার এক সোনার দোকানের মালিক। আপনার আন্দাজ একেবারে সঠিক, তাকে দিয়ে আমি পরীক্ষা করাই। এই দু'জন ছাড়া আমার পরিবার এবং এলাকার আর কেউ এটা জানুক, তা কিছুতেই চাই না।"

"তার মানে এ রকম একটা আসল ছিল। হয় চুরি গিয়েছে, নয়তো কেউ সরিয়ে রেখেছে," বললেন দীপকাকু।

ঝিনুক খানিক আগেই মুকুটটা টেবিলে নামিয়ে রেখেছে, এখন কান খাড়া রেখে নিজের লাগেজ ব্যাগ থেকে বার করছে ডায়েরি আর পেন। যা কথা হচ্ছে, পয়েন্ট লিখে রাখতে হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে এটাই তার প্রাথমিক এবং প্রধান কাজ।

মুকুটটার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন মোহিতবাবু। দীপকাকুর কথার উত্তর দিতে একটু সময় নিলেন। বললেন, "চুরি গিয়েছে। শুধু জিনিসটা চুরি যায়নি, গিয়েছে আমার সম্মান। ব্যাপারটা জানাজানি হলে সকলের কাছে মাথা হেঁট হয়ে যাবে।"

"চুরির ব্যাপারটা ডিটেলে বলুন। আর নকলটা কে বানিয়েছে?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"বলছি। তার আগে জিনিসটা যথাস্থানে রেখে আসি। কখন কে এসে পড়বে। সন্দেহ করতে পারে, এটার কারণেই এসেছেন," বলতে-বলতে নকল মুকুট লাল কাপড়টায় মুড়ে নিয়েছেন মোহিতবাবু। দীপকাকু বলে ওঠেন, "আমাদের মিটিংটা যে সিক্রেট নয়, বোঝাতেই আপনি প্যাসেজের গেটটা তালা মারেননি। শুধু ল্যাচটা টেনে দিয়েছেন।"

মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন মোহিতবাবু। হাতে কাপড় মোড়া মুকুট। দীপকাকুর কথায় ওঁর চোখ-মুখে প্রশংসার ঝিলিক দেখা দিল। বললেন, "ঠিকই ধরেছেন। তবে ওই হুড়কো খুলে কেউ যদি আসতে চায়, ভালই আওয়াজ হবে গেটে। ততক্ষণে পরিস্থিতি বদলে ফেলার সুযোগ পাব।"

কথা শেষ করে মোহিতবাবু এগিয়ে গেলেন সিন্দুকের কাছে। জিনিসটা ভিতরে রেখে বন্ধ করলেন পাল্লা। জাহাজের স্টিয়ারিং মার্কা হাতলটা নানান কায়দায় ঘোরাতে লাগলেন। ঝিনুককে শুনিয়ে দীপকাকু চাপা স্বরে বলে উঠলেন, "নাম্বারিং লক। চারটে নাম্বার।"

এই ধরনের সিন্দুক ঝিনুক প্রথমবার দেখল। কাজ সেরে মোহিতবাবু চলে গেলেন দরজার পাশে পালঙ্কের আর-এক প্রান্তে। ওখানে বেডসাইড টেবিলের উপর ফোন সেট। রিসিভার তুলে একটা সুইচ টিপে বললেন, "উপরে দু'জনের জল-মিষ্টি পাঠিয়ে দাও।"

বোঝা গেল সেটটা ইন্টারকম, ডিজাইন কিন্তু পুরনো আমলের। দীপকাকু বলে ওঠেন, "মিষ্টি-টিষ্টির কোনও দরকার নেই। আমরা ট্রেনে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছি। এখন একটু চা হলেই চলবে।"

"তা কী করে হয়! অতিথি সৎকারের সুযোগটুকু না দিলে চলবে কেন?" বলতে-বলতে এগিয়ে আসছেন মোহিতবাবু। ঝিনুক চট করে চেয়ার ছেড়ে মোড়ায় গিয়ে বসে। মোহিতবাবুকে মোড়াটায় ঠিক মানাচ্ছিল না। ঝিনুকের ছেড়ে দেওয়া চেয়ারে এসে বসলেন মোহিতবাবু। বললেন, "আপনার শেষের প্রশ্নটা ছিল নকল মুকুটা কে তৈরি করিয়েছে? চোর করিয়েছে। এবারের পুজোয় সকলের অগোচরে আসল মুকুট দেবীর মাথা থেকে তুলে নিয়ে রেখে দিয়েছে নকলটা।"

ঝিনুক নড়েচড়ে বসে। কেসটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। মোহিতবাবু বলতে থাকলেন, "আসল মুকুট খুব প্রাচীন নয়, আমার ঠাকুরদার আমলে তৈরি। আমাদের পরিবার অনেকটা এলাকা জুড়ে কয়লাখনির মালিক ছিল। ঠাকুরদা ব্যবসায় একবার বিপুল লাভ করেন। তখনই আমাদের বাড়ির কালীমন্দিরে প্রতিমার জন্য সোনার মুকুটটা করান। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমার প্রপিতামহ। প্রতিমা স্থায়ী, পাথরের। বাড়িতে ঢোকার সময় মন্দিরটা খেয়াল করেছেন?"

প্রশ্নটা দীপকাকুর উদ্দেশে। উনিই উত্তর দিলেন, "করেছি।"

আবার শুরু করলেন মোহিতবাবু, শুধু কালীপুজোর দিনই মাকে মুকুটটা পরানো হয়। বছরের বাকি দিন সিন্দুকে থাকে। ঠাকুরদার সময় থেকেই এই নিয়ম।"

"এখানকার মূল্যে মুকুটটার দাম কত হবে?" কথা কেটে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

মোহিতবাবু বললেন, "তা ধরুন, এখন যা সোনার দাম হয়েছে পঁচিশ লাখ তো হবেই। পাথরগুলো সব অরিজিনাল।"

ঝিনুক নোট নিচ্ছিল। পেন ধরা হাত থেমে গিয়েছে। মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে বুঝতে পেরে বন্ধ করে নেয়। দাম শুনে দীপকাকু চমকাননি। স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "প্রতিমাতে মুকুটটা পরান কি পুরোহিত?"

"না, গৃহকর্তা। ঠাকুরদা পরিয়েছেন। তারপর বাবা। এখন আমি। কালীপুজোর সকালে প্রতিমার অঙ্গরাগ শেষ হলে পরানো হয় মুকুট। পরের দিন ভোরে পুজো শেষে ভক্তদের ভোগপ্রসাদ খাওয়ার পর খোলা হয়। খোলা-পরানো, দু'টো কাজই গৃহকর্তা করেন।"

মোহিতবাবু থামতেই দীপকাকু জানতে চাইলেন, "অঙ্গরাগ ব্যাপারটা কীরকম?"

"পুজোর আগের দিন থেকে শুরু হয় অঙ্গরাগ। পাথরের প্রতিমা জল দিয়ে ধোয়া-মোছা হয়, রং করাও হয় প্রয়োজন মতো। শাড়ি, গয়নাগাঁটি পরানো হয় দেবীকে। গয়না অবশ্য অল্পই। আমাদের প্রতিমার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শাড়ি পরিহিতা কালীমূর্তি। এসবই হল অঙ্গরাগ।"

"তার মানে, ছোটখাটো গয়নাগুলো রয়ে গেল। শুধু মুকুটটাই হাওয়া!" দীপকাকুর গলায় বিস্ময়।

মোহিতবাবু আরও খানিকটা অবাক ভাব যোগ করে বললেন, সেটাই তো আশ্চর্যের। পুজোর দিন ভোর থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত মন্দিরের দরজা খোলা। সব সময় লোকজন ভিড় করে আছে। বাড়ির লোক, পাড়া প্রতিবেশী। দূর থেকেও পুণ্যার্থীরা আসে। সকলের চোখের সামনে থেকে কখন যে আসল মুকুট সরিয়ে নকলটা রেখে দিল, যেন ম্যাজিক!

দীপকাকু চুপ করে আছেন। নিচতলায় বাইক স্টার্ট হওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। দূরে চলে যাচ্ছে শব্দ। সম্ভবত এই আওয়াজটাই মোহিতবাবুর নাতি নীচের ঘরে ঢোকার খানিক আগে শুনেছিল ঝিনুক। এর পর মোহিতবাবুই কথা শুরু করলেন, "ঠাকুরের গায়ের গয়না ছাড়াও ভক্তরা মাকে টুকটাক সোনার জিনিস উৎসর্গ করে। যেমন, টিকলি, নথ, সোনার বেলপাতা। সে সব প্রতিমার

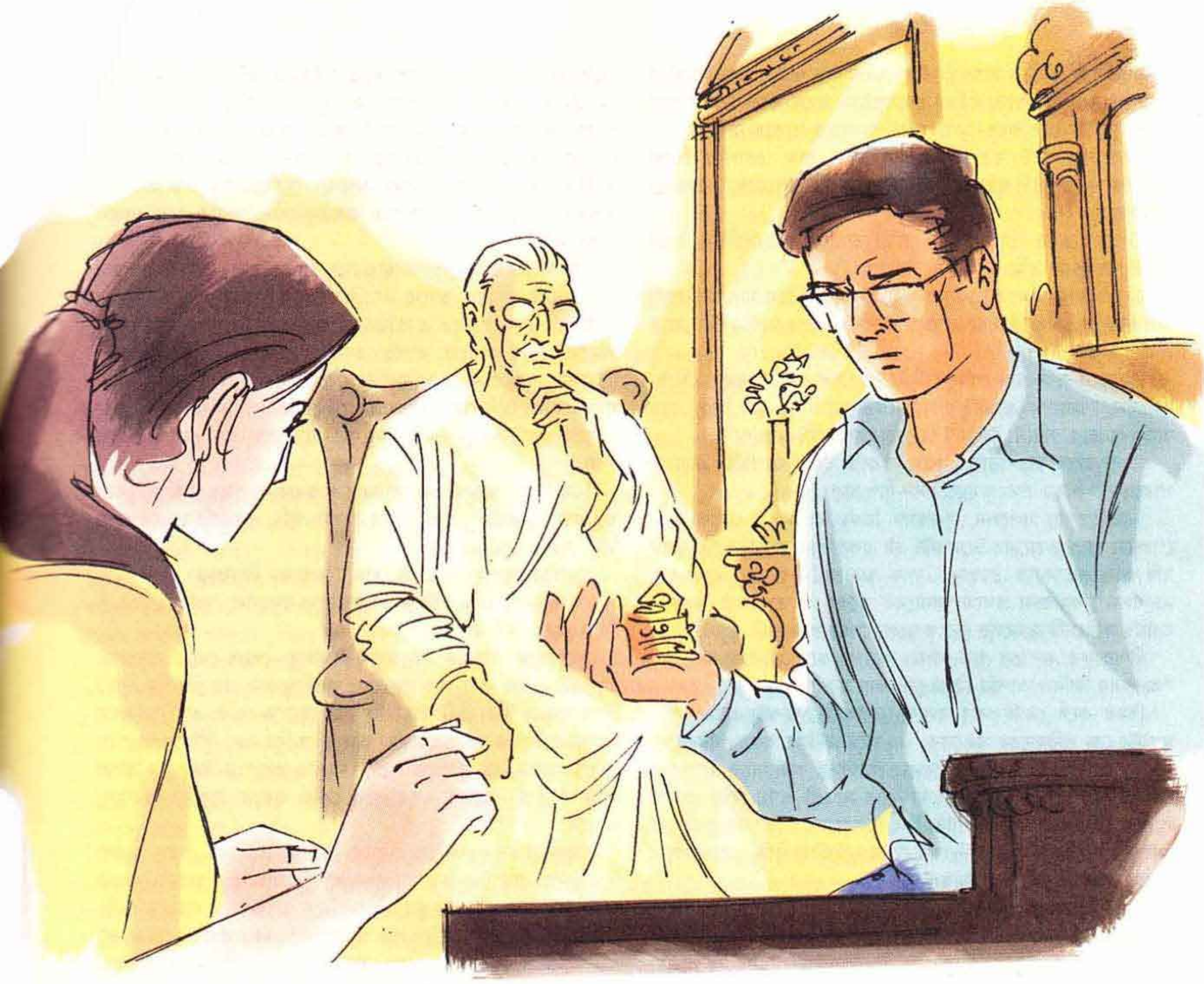

বেদির সামনে একটা থালায় রাখা থাকে।"

"সারা বছর?" কথা কাটলেন দীপকাকু।

"না, শুধু কালীপুজোর দিনটায়ই। অন্য সময় ঠাকুরের গয়না, মুকুটের সঙ্গে আমার ঘরের এই সিন্দুকেই থাকে। বছরে একবারই সব বের করা হয়। পুজোর দিন খোলা অবস্থায় খুচরো সোনার জিনিসগুলো পড়ে থাকা সত্ত্বেও একটাও চুরি হল না। শুধু মুকুটটাই...।"

"কারণ, সব ক'টা সোনার জিনিসের নকল করা সম্ভব ছিল না চোরের। এখান থেকে একটা ব্যাপার বুঝতে হবে, চোর চায়নি জিনিসটা চুরি হয়েছে, সেটা কেউ টের পাক। সেই জন্যেই একটা রেপ্লিকা তৈরি করতে হয়েছে তাকে। এমনিতে তো চুরি করতে পারলেই তার কাজ হাসিল," বললেন দীপকাকু।

ঝিনুক জিজ্ঞেস করল, "কেউ টের পাক, কেন চায়নি চোর?"

"অনেক ক'টা কারণ আছে। প্রধান দু'টো হচ্ছে, প্রতিমার মাথায় কালীপুজোর দিন হঠাৎ মুকুট উধাও হলে, তখনই খোঁজ তল্লাশ পড়ে যাবে, চোর আসানসোল ছাড়ার সুযোগ পাবে না। ধরা পড়ে যাবে পুলিশের জালে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, চোর চায় জিনিসটা লোকে আসল বলেই জানুক। চুরি যে হয়েছে, এটা যেন কেউ ধরতে না পারে। কোনওদিনই খোঁজ করা হবে না চোরের।"

দীপকাকু শেষ করতেই ঝিনুক বলে উঠল, "তা হলে ধরে নিতে হবে চোর বাইরে থেকে আসা অপরিচিত কেউ নয়। চেনা পরিচিতজনের মধ্যেই কেউ হবে। নকল করার সুযোগ পেয়েছে আসল মুকুটটার।"

কপাল কুঁচকে গিয়েছে দীপকাকুর। চিন্তিত স্বরে বললেন, "এখানেই তো বড় খটকা। মুকুটটা নকল করতে গেলে আসলটা পেতে হবে হাতে। আসলটা যদি পেয়েই যায় কালীপুজোর বেশ কিছুদিন আগে, নকল তৈরি করতে গেল কেন চোর?"

কোটি টাকার প্রশ্ন! ঝিনুক, মোহিতবাবুর মধ্যে বিভ্রান্ত দৃষ্টি বিনিময় হল। দীপকাকু নিজেই মনে হচ্ছে কোনও একটা দিশা পেলেন। চশমার নীচে ঝিলিক দিয়ে উঠল তাঁর চোখ। মোহিতবাবুর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, "সম্প্রতি আপনি কি মুকুটটা পালিশ করিয়ে ছিলেন? এমন কোনও চেনা লোক যাকে দিয়ে আগেও করিয়েছেন? পালিশওলাদের জিনিস বদল করার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।"

মোহিতবাবু মাথা নাড়ছেন। বললেন, "বছরপাঁচেক আগে শেষ একবার পালিশ করিয়েছিলাম। তাও এই ঘরে, নিজে বসে থেকে। এক মিনিটের জন্যেও উঠিনি।"

দীপকাকুর কপালে ফিরে এল ভাঁজ। দৃষ্টি মেঝেয়। মোহিতবাবু বলে যেতে লাগলেন, "সিন্দুক থেকে হাতানোর কোনও সুযোগ নেই। নম্বর দেওয়া লক। পরপর নম্বরগুলো একমাত্র আমি জানি। সেট

করেছি নিজে। সিন্দুক খুলে মুকুটটা বের করার পর পুজোর সময়টুকু বাদে কখনওই কাছছাড়া করিনি কোনওদিন। ফলে ফাঁকতালে সিন্দুক থেকে মুকুটটা বের করে নকল করার আশঙ্কাও থাকছে না।"

"আপনার সেট করা নম্বর যদি ভুলে যান, কোথাও লিখে রেখেছেন? অপরাধী হয়তো সেই লেখাটা খুঁজে পেয়েছে," বললেন দীপকাকু।

"বয়স হয়েছে, ভুলে যেতেই পারি। তবে কোথাও লিখিনি। এমন একটা পদ্ধতি নিয়েছি, মনে ঠিক পড়বেই।"

মোহিতবাবু থামতেই ঝিনুকের মুখ ফুটে বেরিয়ে যায়, "নিজের বার্থ ইয়ারটা কোড হিসেবে ব্যবহার করেননি তো? ভল্টটা তো ফোর ডিজিট লক।"

এতক্ষণে সরু এক ফালি হাসি দেখা গেল মোহিতবাবুর ঠোঁটে। বললেন, "আমাকে এতটাই ব্যাকডেটেড ভেবো না। অত ইজি কোড আমি ব্যবহার করিনি। টাইম টু টাইম বদলেও নিই নাম্বার।"

"'তা হলে যা দাঁড়াল, নকল করতে হলে আপনিই একমাত্র পারতেন," বিষয় প্রসঙ্গে ফেরালেন দীপকাকু।

মোহিতবাবু বললেন, "একদম ঠিক। আপনাকে ডেকে এনে গোপনে তদন্ত করানোর উদ্দেশ্যটা এই একই কারণে। চুরির পর আমি যদি পুলিশের কাছে যেতাম, লোক জানাজানি হত। পুলিশ এবং মানুষজন চুরির জন্য প্রথমে আমাকেই সন্দেহ করত। বলত, নকলটা আমিই করিয়েছি সকলের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য।"

দীপকাকুর কপালে গাঢ় ভাঁজ। অবাক কণ্ঠে জানতে চাইলেন, "আপনার জিনিস আপনি নিজে চুরি করতে যাবেন কেন?"

বিমর্ষ কণ্ঠে মোহিতবাবু বললেন, "আমি গৃহকর্তা হতে পারি, মুকুটটা তো পরিবারের সকলের। ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরিবারের সম্মান, আবেগ। এলাকার লোকেরাও আমদের কালীমাকে নিজেদের দেবতা বলে মানে। ইচ্ছেমতো মন্দিরের সামগ্রী আমি বিক্রি করতে পারি না। আইনত অবশ্যই পারি। কিন্তু ভগবানের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা তো আইনের অনেক উপরে। মন্দিরের কোনও জিনিস বিক্রি করলে আমি সকলের চোখে ছোট হয়ে যাব।"

"তাই বিক্রি করতে হলে আপনাকে চুরি করতে হবে। চুরির ঘটনা জানাজানি হলে লোকের সন্দেহ প্রথমে আপনার উপরেই পড়বে। কিন্তু কেন করবেন চুরি? উদ্দেশ্যটা কী? মোটিভ দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত লোকে সহজে আপনার দিকে আঙুল তুলবে না।"

বক্তব্যের আড়ালে দীপকাকু আসলে উদ্দেশ্যটাই জানতে চাইলেন। মোহিতবাবু সেটা ধরতে পারলেন বলে মনে হল না। আগের মতোই বিষণ্ণ গলায় বললেন, "মোটিভ তো চোখের সামনেই আছে। বেশ কিছু বছর ধরে টানাটানি চলছে আমার ব্যবসায়। অনেকেরই ব্যাপারটা জানা।"

"আপনার বিজনেসে আর কোনও অংশীদার কি আছে? আর এই বাড়িরই বা শরিক ক'জন?"

"ব্যবসা, বাড়ি-জমির মালিক আমি একাই। এই এলাকার অন্য কয়লা খনির মতো সরকার যখন ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমাদের খনি অধিগ্রহণ করে, সেই টাকায় আমি ঠিকাদারির বিজনেস শুরু করি। কোলফিল্ডে সাপ্লাই করতে থাকি ওদের প্রয়োজনীয় নানান জিনিসপত্র। প্রথম পনেরো-বিশ বছর প্রচুর লাভ হয়। আমার দুই ভাই ততদিনে পরিবার, চাকরি সমেত বাইরে সেটল্ড। বোনেরও ভাল ঘরে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। একমাত্র ছোট ভাই সপরিবার এ বাড়িতে থাকে। চাকরি করে রেলে। আসানসোলের স্টেশনমাস্টার। আমি সকলকে প্রস্তাব দিই টাকা নিয়ে তাদের ব্যবসা, জমিবাড়ির অংশ আমাকে ছেড়ে দিতে। তারা একবাক্যে রাজি হয়ে যায়," টানা কথা বলে দম নিতে থামলেন মোহিতবাবু।

দীপকাকু জানতে চাইলেন, "ছোট ভাই কেন এখনও এ বাড়িতে থাকেন? প্রাপ্য যখন পেয়েই গিয়েছেন নিজের?"

"আমিই থাকতে বলেছি। বাড়িতে প্রচুর জায়গা। বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। ব্যবসার হালহকিকত বুঝে ছোট ভাই এখানে থাকার ভাড়া দিতে এসেছিল, হাত পেতে নিতে পারিনি। অথচ এত বড় বাড়ির মেন্টেন্যান্স, কাজের লোকদের মাইনে, বৎসরান্তে অত ঘটা করে পুজো, আমার পক্ষে টানা খুবই কঠিন কাজ হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির লাগোয়া কিছু জমি যে বিক্রি করে দেব, সেটা ভাবতেও কেমন লাগে। আত্মীয়স্বজন, এলাকার লোক বলবে, 'মোহিতলাল রায় কত বড় অপদার্থ, বাড়ির বড় ছেলে হয়ে বাপঠাকুরদার সম্পত্তি ধরে রাখতে পারল না'!"

প্যাসেজের গেট খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ল্যাচ টানার শব্দ খুব জোরেই হয়েছে, চমকে উঠেছিল ঝিনুক। ট্রেতে দু' প্লেট খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল সম্ভবত এ বাড়ির কাজের ছেলে। লুচির পাহাড় দেখে ঝিনুকের চোখ কপালে। বলেই ফেলল, "এ্যাত্তো!"

"আরে, খাও-খাও। সুমিতাভর থেকে তোমার কীর্তিকলাপ আমি সব শুনেছি। তুমি মেয়ে হয়েও চারটে ছেলের সমান ক্ষমতা ধরো," বললেন মোহিতবাবু। গলায় ঝিনুকের প্রতি স্নেহ, গর্ব দু'টোই প্রকাশ পেল।

ঝিনুক মনে-মনে বলল, তা বলে খাওয়ার ব্যাপারেও কম্পিটিশন! এর ওয়ান ফোর্থও খেতে পারবে না সে। লুচি, তরকারি ছাড়াও প্রচুর মিষ্টি দেওয়া হয়েছে।

"বাইরে হাত-মুখটা একটু ধোব," বললেন দীপকাকু।

মোহিতবাবু দরজার দিকে আঙুল তুলে বললেন, "করিডোরের বাঁ দিকে আছে বেসিন।"

হাত ধুয়ে এসেছে ঝিনুকরা। দীপকাকু খেতে-খেতে বললেন, "মুকুটটা উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। কালীপুজোর পর পাঁচদিন কেটে গিয়ে আজ ছ'দিন। জিনিসটা বিক্রি করে দিয়েছে চোর। এতদিনে সেটা হয়তো গলিয়েও ফেলা হয়েছে। অথবা যে কিনেছে, লুকিয়ে রেখেছে সযত্নে। জানে, চোরাই মাল। চোর অত্যন্ত গোপনে জিনিসটা তাকে বিক্রি করেছে। অনেক বছর পরে ক্রেতা হয়তো মুকুটটা প্রকাশ্যে আনবে।"

"মুকুটটা ফেরত পাওয়ার আশা করি না আমিও। পেলে অবশ্য তার চেয়ে ভাল কিছু হয় না। তবে আপনি যদি শুধু চোরকে শনাক্ত করে দেন এবং পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে তাকে জেল খাটাতে পারি, তাতেই আমার শান্তি। চুরির দায় আমার ঘাড়ে চাপবে না। আজ না হয় কাল লোকে জানবেই আমার কাছে রাখা মুকুটটা নকল। যেমন, আগুপিছু কিছু না জেনেই আপনি জিনিসটা সামান্য পরখ করেই বুঝে ফেললেন।"

"আপনি কখন কীভাবে টের পেয়েছিলেন জিনিসটা নকল?" মোহিতবাবুর কথার পিঠে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"আমি টের পেলাম পুজোপর্ব মেটার পর প্রতিমার মাথা থেকে মুকুটটা খোলার সময়। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল, আপনার মতোই জিনিসটা ওজনে ভারী ঠেকেছিল। পরানোর সময় তো খটকা লাগেনি। প্রত্যেক বছর খুলছি, পরাচ্ছি, ওজনের তফাত করা আমার পক্ষে মুশকিল নয়। তবে আপনার মতো আমি মুকুটের কারুকাজ, পালিশ দেখে আসল-নকল ধরতে পারিনি। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেই কারণেই গোরাচাঁদ স্যাকরাকে দেখাই। ও একেবারে নিশ্চিত করে জানায় জিনিসটা নকল।"

"লোকটার দোকানে গিয়েছিলেন, না বাড়িতে ডেকে নেন?"

প্রশ্নটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত! দীপকাকু কেন জানতে চাইলেন বুঝতে পারল না ঝিনুক। থতমত খেয়েছেন মোহিতবাবুও। বললেন, "দোকানেই গিয়েছিলাম। কেন বলুন তো?"

"না, সেরকম কিছু না। মানুষটা নিশ্চয়ই খুব বিশ্বাসী। খবরটা কানাকানি করবে না?"

"আশা তো করি করবে না। ওদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের কয়েক পুরুষের সম্পর্ক। এ বাড়ির গয়নাগাঁটির সব কাজই ওদের দিয়ে হয়। এমনকী, বিজনেসে হঠাৎ যদি আমার টাকার দরকার পড়ে, গোরাচাঁদের কাছে ইন্টারেস্টে ধার নিই। অনেক করে বলেছি মুকুটের কথাটা যেন পাঁচকান না করে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখতে

চাইলে গোপন রাখবে ব্যাপারটা। আমাকে চটালে ওর বিজনেসের ক্ষতি।"

মোহিতবাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই প্যাসেজের গেটের আওয়াজ পাওয়া গেল। একটু পরেই চা নিয়ে ঢুকল কাজের ছেলেটি। ঝিনুকের চোখ যায় দীপকাকুর প্লেটে, ছেলেটা কি আগে এসে পড়ল? না, দীপকাকুর প্লেট ফাঁকা! কখন খেয়ে ফেললেন সব! ঝিনুক সবে দু'টো লুচি খেতে পেরেছে।

ট্রে থেকে তিনকাপ চা টেবিলে নামিয়ে দীপকাকুর ফাঁকা প্লেট নিয়ে চলে গেল ছেলেটি। কাপ তুলে এক চুমুক মেরে দীপকাকু চিন্তান্বিত গলায় বললেন, "আপনার কেসটা খুবই কঠিন কিংবা অত্যন্ত জটিল বলাই বোধ হয় ভাল।"

"মানতে পারলাম না," ঝুঁকে ট্রে থেকে কাপ তুলে নিতে-নিতে বললেন মোহিতবাবু। সোজা হয়ে ফের বললেন, "আপনার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়, সুমিতাভর থেকে তো শুনেছি আপনার কর্মদক্ষতা। যে বিষ পেটে গিয়ে উধাও হয়ে যায়, কোনও প্রমাণ রাখে না, সেই বিষকেও আপনি শনাক্ত করেছেন, একই সঙ্গে খুনিকেও।"

প্রশস্তি ছুঁল না দীপকাকুকে। সিরিয়াস মুখ করে চা খাচ্ছেন। বলতে থাকলেন, "ওই কেসটায় ঘটনার সময় আশপাশে ছিলাম আমি। এ ক্ষেত্রে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মুকুটটা পরানোর সময় আপনার কোনও খটকা লাগেনি, এই কথাটার উপর নির্ভর করা উচিত হবে না। পুজোর ব্যস্ততায় হয়তো খেয়াল করেননি ওজনের তারতম্য। খোলার সময় পুজোর পরিবেশ শান্ত, তফাতটা টের পান। অর্থাৎ আপনি হয়তো পরিয়েছেন নকল মুকুটটা। চুরি যাওয়ার মাঝে কতটা সময় চলে গিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। কোনও সূত্র পড়ে থাকার কথা নয়। কোন রাস্তা ধরে এগোব, সেটাই ঠাহর করতে পারছি না। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও একটা সমস্যা। আপনার কন্ডিশন অনুযায়ী আমাকে তদন্ত করতে হবে গোপনে। জেরা করার সুযোগ পাব না আপনার চারপাশের লোকজনকে।"

দীপকাকুর অসুবিধেগুলো সম্ভবত অনুভব করলেন মোহিতবাবু। পরপর চুমুকে চা শেষ করে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন কাপ। আশ্বস্ত করার স্বরে বললেন, "আপনি কাজ শুরু করুন না। মোটামুটি যখন একটা আন্দাজ পেয়ে যাবেন অপরাধী কে হতে পারে, তখন না হয় আপনার আসল পরিচয় সকলকে জানিয়ে দেব।"

সিরিয়াস ভাব কেটে গিয়ে দীপকাকুর মুখ একটু বুঝি সহজ হল। চা খাওয়া ওঁরও শেষ। ঝিনুক পড়েছে মহা ঝামেলায়, খাওয়া এগোয়নি, এদিকে চা হচ্ছে ঠান্ডা। কীভাবে অবস্থাটা ম্যানেজ করবে ভেবে পাচ্ছে না। দীপকাকু বলে উঠলেন, "এ বাড়িতে যারা থাকে, মানে বসবাসকারীদের একটু পরিচয় দিন।"

অল্প সময় নিয়ে মোহিতবাবু বলতে থাকলেন, "আমি থাকি। স্ত্রী মারা গিয়েছেন বছর দশেক। আমার ছেলে-বউমা। নাতি সুবর্ণকে তো দেখলেন। ছোট ভাইয়ের পরিবার বলতে, ওর স্ত্রী, ছেলে-বউমা, ওদের ছোট-ছোট দু'টো মেয়ে। আর থাকে এ বাড়ির কেয়ারটেকার বা ম্যানেজার যাই বলুন, শশাঙ্ক, যে আপনারদের রিসিভ করল বাড়িতে। তবে শশাঙ্ক এই বিল্ডিংটায় থাকে না। উলটো দিকে আউটহাউসে বউ-ছেলে নিয়ে ওর সংসার। ওর পাশের কোয়ার্টারে দু'জন পাহারাদার। এ বাড়িতে চারজন কাজের লোক। দু'জন মেয়ে আর দু'টি ছেলে। একজনকে দেখলেন, যে আপনাদের চা, জলখাবার দিল।"

"এবারের পুজোয় আপনার আত্মীয়স্বজন কারা-কারা এসেছিলেন, যারা রাত্রিবাস করেছেন?"

"বোন, ভগ্নিপতি তাদের দুই ছেলে নিয়ে এসেছিল। প্রতিবারই আসে। প্রবাসে থাকা দুই ভাই লাস্ট দু'বছরে আসেনি। আমার এবং ছোট ভাইয়ের একটি করে কন্যা সন্তান। তাদেরও বিয়ে হয়েছে দূরে। তারাও এখন আর পুজোয় আসতে পারে না।"

অনেক ইমপর্ট্যান্ট কথা হয়ে যাচ্ছে, খাবার লাগা হাতে নোট নিতে পারছে না ঝিনুক। খুব মন দিয়ে শুনে নিচ্ছে। লিখে নেবে পরে।

দীপকাকু গেলেন পরের প্রশ্নে, "সুবর্ণ যে আপনার বিজনেসে জড়িত, বুঝতেই পেরেছি। আপনার, ছোট ভাইয়ের ছেলে এবং শশাঙ্কবাবুর ছেলের প্রফেশন কী? বাড়ির মহিলারা কি চাকরি বা বিজনেস কিছু করেন?"

"ছোট ভাইয়ের ছেলে-বউমা দু'জনেই ই সি এল-এর স্টাফ। বাকি সব মেয়েরা বাড়ির কাজকর্মই করে। আমার ছেলেই মূলত ব্যবসাটা চালায়। আমি এখন পরামর্শদাতা। শশাঙ্কর ছেলে এখানকার এক টিউটোরিয়াল হোমে পড়ায়। আমাদের বিজনেসের হিসেবপত্র দ্যাখে। ভাইয়ের দুই নাতনি ওর কাছে পড়ে।"

দীপকাকু একটু নড়েচড়ে বসে বলল, "এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। ওরকম একটা দামি জিনিস, পঁচিশ লাখ মতো যার দাম, বাড়িতে রেখেছিলেন কেন? সিকিওরিটির ব্যবস্থা তেমন মজবুত নয়। ভল্টের কারণে চুরি না হলেও, ডাকাতি তো হতে পারত। জিনিসটা যে ব্যাঙ্কের লকারে থাকে না, সেটা অনেকেরই জানা। ডাকাতদের কানে পৌঁছতে কতক্ষণ! ইনসিওরেন্সও নিশ্চয়ই করানো ছিল না মুকুটটার, থাকলে এতক্ষণে বলতেন। একটু বেশিই ঝুঁকি নেননি কি?"

বড় করে শ্বাস ছেড়ে মোহিতবাবু বললেন, "ইনসিওরেন্সের কথা এবার উঠেছিল। অভিজিৎ, মানে শশাঙ্কর ছেলে অ্যাডভাইসটা দেয়। যে হারে দাম বাড়ছে সোনার! হয়তো এ বছরই করাতাম ইনসিওরেন্স, তার আগেই..."

আক্ষেপের কারণে কথা অসম্পূর্ণ রইল। ফের মোহিতবাবু বললেন, "তবে উপর থেকে সিকিউরিটি যতটা কম মনে হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। আমি ঘরে না থাকলে প্যাসেজের গেটে তালা দিতে ভুলি না। মুকুটটা ছাড়া বিজনেসের টাকাকড়ি, দরকারি কাগজপত্রও থাকে ভল্টে। রাতে বাড়ির সব গেট বন্ধ হয়ে যায়। দুই পাহারাদার সারারাত টহল দেয়। আর আছে আমার নামে লাইসেন্সড রাইফেল।"

"বন্দুক চালাতে পারেন আপনি?" বিস্ময়ের গলায় জিজ্ঞেস করে ফ্যালে ঝিনুক।

মোহিতবাবু মৃদু হাসিসমেত বললেন, "একেবারে অব্যর্থ নিশানায়। কয়লাখনি অঞ্চলে দাপিয়ে বিজনেস করতে হলে জানতেই হয়। গুন্ডা, বদমাশ গিজগিজ করছে।"

মোহিতবাবু এবার দীপকাকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি খাটিয়ে মুকুটটা চুরি করা হয়েছে। এ প্রায় সাপের গর্ত থেকে রত্ন চুরি করার মতো। সেই বুদ্ধিকে টেক্কা দিতেই আপনার মতো গোয়েন্দার শরণাপন্ন হয়েছি।"

শেষ কথাটা দীপকাকু শুনলেন কি না বোঝা গেল না। মোহিতবাবু থামতেই প্রশ্ন করলেন, "বাইরের লোক নিয়মিত এ বাড়িতে কে-কে আসে? কতক্ষণ থাকে? আপনি কি এ ঘরেই তাদের সঙ্গে মিট করেন?"

"বাইরের অনেক লোক আসে। বিজনেসের কারণে, এলাকার নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে। নিছক আড্ডা দিতেও আসে। তবে কারও সঙ্গেই আমি এ ঘরে মিট করি না। নীচের বৈঠকখানায় বসে কথা হয়। খুব প্রয়োজন ছাড়া এ বাড়ির সদস্যরাও বড় একটা এ ঘরে আসে না। চা দিতে আসা আর ঘর পরিষ্কারের জন্য কাজের লোক দু'জন নিয়মিত ঢোকে। খাবার আমি নীচে ডাইনিংয়ে গিয়ে খাই।"

দীপকাকুর দৃষ্টি এখন সিন্দুকের দিকে। ঠায় তাকিয়ে আছেন। কী দেখছেন, ভাবছেন বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ বলে উঠলেন, "কাজটায় তা হলে নেমেই পড়ি, কী বলেন?"

স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন মোহিতবাবু। তিনি তো কেস নেওয়ার জন্যই ডেকে পাঠিয়েছেন দীপকাকুকে। এখন আবার পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে কেন? ঝিনুক জানে দীপকাকু তখনই এরকম এলোমেলো কথা বলেন, কেসের গভীরে যে সময় থেকে ঢুকে যান। সমাধানের ক্ষীণতম আলো চোখে পড়তে থাকে তাঁর।

চেয়ারে বসা মোহিতবাবু একপাশে একটু কাত হয়ে পাঞ্জাবির

পকেট থেকে বার করলেন একটা খাম। টাকা আছে বলেই মনে হচ্ছে। দীপকাকুর উদ্দেশে খামটা বাড়িয়ে বললেন, "আপনার জন্য কিছু অ্যাডভান্স। হোটেল ডিউক, এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেল। সেখানে অমল ঘোষ নাম দিয়ে দু'টো রুম বুক করা আছে। কলকাতার যে অফিস অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর দিতে বলেছিলেন, তাও দিয়েছি। হোটেলে আপনার পরিচয়, অমল ঘোষ সিনেমা হাউসের প্রোডাকশন ম্যানেজার। আজকের দিনটা রেস্ট নিন। কাল শুটিংয়ের জায়গা দেখা বা বাছার অজুহাতে এ বাড়িতে ফোটো তুলতে আসবেন।"

বাড়ানো খাম দীপকাকু এখনও নেননি। "এক মিনিট," বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন। এ ঘরের ঘড়ি থেকে টানা ঘণ্টা বাজা শুরু হল। নীচের গ্র্যান্ডফাদার ক্লক থেকেও ভেসে আসছে আওয়াজ। এগারোটা বাজল। দীপকাকু হাত ধুতে গিয়েছিলেন। ফিরে আসছেন রুমালে হাত মুছতে-মুছতে। মোহিতবাবুর থেকে টাকা খাম নিয়ে চেয়ারের পাশে মেঝেতে রাখা লাগেজব্যাগে ঢোকালেন। ফের বার করলেন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস, সঙ্গে টর্চ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছেন! জিনিস দু'টো কেন বের করলেন, সেটাই মনে পড়ছে না হয়তো। এরকম ছোটখাটো ভুল হামেশাই হয় দীপকাকুর। দেখা গেল এটা তা নয়। মোহিতবাবুর দিকে ঘুরে জানতে চাইলেন, "এবারের কালীপুজোয় কোনও ভিডিওগ্রাফি হয়নি? কেউ ফোটো তুলে রাখেনি পুজো অনুষ্ঠানের?"

কথাটা ধরতে একটু সময় লাগল মোহিতবাবুর। বললেন, "সে তো গত কয়েক বছর ধরে হচ্ছে। সুবর্ণ ছোট মুভিক্যামেরা কেনার পর থেকে। তবে খেলাচ্ছলে তোলা। নাতনি দু'টোও তোলে।"

"এবারে পুজোর একটা সিডি পাওয়া যাবে?"

"তা বোধ হয় পাওয়া যাবে। সুবর্ণ প্রতিবারই বানায়। দেখায় বাড়ির সকলকে। কিন্তু কী অজুহাতে চাইব?"

"আমার অজুহাতই দেবেন। বলবেন, ওদের সিনেমায় কালীপুজোর সিন থাকবে। আমাদের পুজোটা দেখলে একটা রেফারেন্স পাবে ওরা।"

সন্তুষ্ট হলেন মোহিতবাবু। দু' পাশে মাথা নেড়ে বললেন, "বাঃ, এই কথাটাই বলব।"

দীপকাকু চলে গেলেন সিন্দুকের কাছে। হাঁটু মুড়ে বসে টর্চ জ্বালিয়ে আতশকাচ দিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন সিন্দুকের আগাপাশতলা। ঝিনুকও উঠে যায়। দেখা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন দীপকাকু। মোহিতবাবু ততক্ষণে চলে এসেছেন। দীপকাকু তাঁর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "ভল্টটা খুব পুরনো নয়। আপনার আমলেই তৈরি। কত বছর হল?"

"বছর কুড়ি তো হবেই। কলকাতায় বউবাজারের একটা দোকানে অর্ডার দিয়ে বানিয়েছিলাম।"

"দোকানের ঠিকানা, ফোন নম্বর আছে এখনও, মানে বিল, ক্যাশমেমো...।"

"নিশ্চয়ই আছে। দরকারি কাগজপত্র আমি চট করে ফেলি না। তবে একটু খুঁজতে হবে।"

"খুঁজে রাখবেন। কাজে লাগতে পারে আমার," একটু থেমে দীপকাকু বললেন, "এখন তা হলে চলি।"

নিজের লাগেজ নিতে চেয়ারের দিকে এগোলেন দীপকাকু। ঝিনুক দ্রুত পায়ে অনুসরণ করে। ছোট্ট একটা আশঙ্কায় ভুগছে সে, এই হয়তো মোহিতবাবু তার উদ্দেশে বলে উঠবেন, "এ কী, তুমি তো কিছুই খেলে না!" এ ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলে বাঁচে ঝিনুক।

॥ ২ ॥

ডিউক হোটেলটা রেলস্টেশন আর উষাগ্রামের প্রায় মাঝামাঝি মুগাসোল অঞ্চলে। আসার সময় সাইকেল রিকশায় এসেছে ঝিনুকরা। অভিজাত হোটেল। জি টি রোডের ঠিক গায়েই। সেকেন্ড ফ্লোরে দীপকাকু আর ঝিনুকের পাশাপাশি রুম। দু'টোই এ সি। এই ওয়েদারে এ সি-র অবশ্য প্রয়োজন হচ্ছে না। হোটেলে চেক ইন করার সময় দীপকাকু বললেন, "তুমি ঘরগুলো দেখে নাও। লাগেজ দু'টো দু' ঘরে রাখো। আমি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি।"

হোটেল ম্যানেজারকে দীপকাকুর কেন প্রয়োজন, এখনও জানা হয়নি ঝিনুকের। কথা সেরে ফিরতে প্রায় আধঘণ্টা নিলেন। ঝিনুক ততক্ষণে স্নানটান করে ফ্রেশ। টোকা দিয়ে রুমে ঢুকে দীপকাকু বলেছিলেন, "গুড, তুমি রেডি। লাঞ্চের অর্ডার দিয়েছি। এক্ষুনি স্নান সেরে নিচ্ছি আমি।"

ফুলকোর্স লাঞ্চের অর্ডার দিয়েছিলেন দীপকাকু। স্নান সেরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে খেতে বসেছিলেন। ঘণ্টা তিনেক আগেই এক পেট খেয়েছেন মোহিতবাবুর বাড়িতে। ওয়েটার হোটেলের ডাইনিং টেবিলে খাবারগুলো যখন সাজিয়ে দিচ্ছিল, সবিস্ময়ে ঝিনুক তাকিয়েছিল দীপকাকুর মুখের দিকে। ছেলেমানুষের মতো হেসে সাফাইয়ের সুরে দীপকাকু বলেছিলেন, "এখানকার জল খুব ভাল। পাথুরে জায়গা তো, ঘনঘন খিদে পেয়ে যায়।"

এখানকার জল কতটুকুই বা খেয়েছে ঝিনুকরা, তাতেই এই খিদে? পরে কী হবে? সে কথায় আর যায়নি ঝিনুক, খেতে-খেতে দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কেসটার ব্যাপারে কী বুঝছেন, অপরাধীকে শনাক্ত করা যাবে? আপনার কথাই ঠিক, যথেষ্ট দেরিতে কাজে নামছি আমরা। খুব বুদ্ধি করে জিনিসটা চুরি করা হয়েছে। অপরাধী ভীষণ ধুরন্ধর।"

"বুদ্ধির প্রয়োগটাই কিন্তু আমাকে রাস্তা দেখাচ্ছে কেসটা সমাধানের।"

"মানে?"

"কেন এত বুদ্ধি খাটাতে হল চোরকে? এ ছাড়া কি আর কোনও উপায় ছিল না চুরি করার? নাকি অপরাধী চায় আসল মুকুট হাতিয়ে নকলটা মোহিতবাবুর হেফাজতে রেখে ওঁর বদনাম করতে? অথবা নকল মুকুট মোহিতবাবু নিজেই তৈরি করেছেন, আসলটা বিক্রি করে বিজনেসের হাল ফেরাবেন বলে।"

"তা হলে আপনাকে তদন্ত করতে ডাকলেন কেন?"

"ডেকেছেন, কিন্তু গোপনে ইনভেস্টিগেট করতে বলেছে, সেটা আদৌ নিজের সম্মান রক্ষার্থে, নাকি সন্দেহের তির ওঁর দিকেই ঘুরছে কিনা বুঝে নিতে? মোহিতবাবুর চুরির প্ল্যানিংয়ের কোনও একটা খুঁত যদি আমি ধরতে পারি, উনি পত্রপাঠ আমাকে বিদায় দেবেন। আর ভুলবশত আমার সন্দেহ অন্য কারও দিকে যদি ঘুরে যায় এবং সেই ব্যক্তি যদি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়ে থাকে, তখনই আত্মীয়পরিজন সকলের কাছে আমার আসল পরিচয় জানিয়ে চুরির দায় থেকে মুক্ত হবেন।"

দীপকাকু থামতেই ঝিনুক বলে উঠেছিল, "সেই কারণেই উনি বলছেন, অপরাধী কে হতে পারে, মোটামুটি একটা আন্দাজ দিতে পারলেই আপনার পরিচয় প্রকাশ্যে আনবেন।"

"একদম ঠিক। উনি সব সময় আমাকে মিসগাইড করার চেষ্টা করবেন। একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, মূল অপরাধী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গোয়েন্দা ডেকে তদন্তের ভার দিচ্ছে, এই কৌশলটা অতি প্রাচীন। আশা করা যায়, মোহিতবাবুও এটা জানেন। আমাকে নিশ্চয়ই একজন নির্বোধ ডিটেকটিভ হিসেবে বেছে নেননি," বলার পর মনোযোগ সহকারে লাঞ্চ সারতে লাগলেন দীপকাকু। ওই কথোপকথন থেকেই ঝিনুক উপলব্ধি করতে শুরু করে চুরির ঘটনা কতটা জটিল! অত বড় বাড়ি, অনেক সদস্য, পুজোর সময় আসা বহিরাগত, কতজনকে সন্দেহ করবেন দীপকাকু? ছদ্ম পরিচয়ের কারণে জেরা করার সুযোগ পাবেন না কাউকে। তদন্ত কীভাবে শুরু করতে হবে, ভাবতে গিয়ে অকূল পাথারে পড়ে যাচ্ছে ঝিনুক। এর চেয়ে মাথা আপাতত না ঘামানোই ভাল। স্রেফ দীপকাকুর গতিবিধি ফলো করে যাবে। লাঞ্চের বাকি সময়টায় আর কোনও কথা তোলেনি ঝিনুক।

খেয়ে উঠে দীপকাকু বলেছিলেন, "এখন একটু গড়িয়ে নিই।

বিকেলে উঠে কেসটার ব্যাপারে কীভাবে এগোব, প্ল্যান করা যাবে। তুমি রেস্ট নিয়ে নাও। তার আগে রজতদাকে ফোন করে জানাও এখানকার খবর। ফোনটার জন্য নিশ্চয়ই ওয়েট করছেন।"

বিকেল পার হয়ে সন্ধে হল, দীপকাকুর রুম এখনও বন্ধ। টানা ঘুম দিচ্ছেন। আর একটু অপেক্ষা করে রুমের দরজায় গিয়ে নক করবে ঝিনুক। এবার তো চিন্তা হচ্ছে তার! এত ঘুমের কারণ কী? লাঞ্চের পর নিজের রুমে এসে ঝিনুক বাবাকে মোহিতবাবুর কেস ডিটেলে জানিয়েছে। বাবা খুব এক্সাইটেড হয়ে বলে উঠলেন, "একেবারে বনেদি কেস রে! তোদের সঙ্গে থাকতে পারলে ভাল হত। ইনভেস্টিগেশন কেমন এগোচ্ছে, টাইম টু টাইম আমাকে জানাবি।"

'বনেদি কেস' কথাটা বাবা তক্ষুনি তৈরি করলেন। সম্ভবত মোহিতবাবুর বাড়ি ও পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড শুনে। মায়ের সঙ্গেও কথা বলে নিয়েছে ঝিনুক। কেসের ব্যাপারে একটি কথাও জানতে চাইলেন না মা। উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে, দুপুরে খেয়েছিস তো? হোটেলটা কেমন?"

বাড়িতে কথা বলে নেওয়ার পর ঝিনুক দু' ঘণ্টার উপর ঘুমোল। বেশিই ঘুমনো হয়ে গিয়েছে ভেবে, গিয়েছিল দীপকাকুর রুমে। দরজা বন্ধ। তারপর থেকে রুমে বসে টিভির চ্যানেল সার্ফ করে যাচ্ছে আর মাঝে-মাঝে উঠে দেখে আসছে দীপকাকুর ঘুম ভাঙল কি না? এরকম একটা জটিল কেস মাথায় নিয়ে মানুষ কী করে এত ঘুমোতে পারে, কে জানে!

বেল বেজে উঠল রুমের। চমকে ওঠে ঝিনুক। বেড থেকে নেমে গিয়ে দরজা খোলে। সামনে দীপকাকু, চোখে-মুখে এখনও ঘুম-ঘুম ভাব। জিজ্ঞেস করলেন, "হোটেল ম্যানেজার ফোন করেছিল?"

"আমাকে কেন করবে?" অবাক হয়ে জানতে চান ঝিনুক।

রুমে ঢুকতে-ঢুকতে দীপকাকু বললেন, "ভাবলাম, আমার ঘুম ভাঙাতে না চেয়ে হয়তো তোমাকে করেছে। এতক্ষণে তো ফোন আসার কথা!"

কেন ফোন আসবে, জানে না ঝিনুক। দীপকাকু রুমের ইন্টারকমের রিসিভার তুলে দু'টো বোতাম টিপলেন। কানে নিয়েছেন রিসিভার। বললেন, "বাগচী বলছি। কোনও খবর?"

ঝিনুক অবাক, দীপকাকু আসল নামটা ম্যানেজারকে বলে দিয়েছেন! ও প্রান্তের কথা শুনছেন দীপকাকু। ভ্রু জোড়া কাছাকাছি এসে স্বস্থানে ফিরল। বলে উঠলেন, "কতক্ষণ হল এসেছিল?...ক্লিপিংস এখনই দেখা যাবে তো?...ওকে, যাচ্ছি আপনার ঘরে।"

দীপকাকুর চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করছে। রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন। ঝিনুককে বললেন, "চলো, নীচে যাই। আমাদের জন্য ইমপর্ট্যান্ট নিউজ অপেক্ষা করছে।"

মুহূর্তে সমস্ত আলস্য কাটিয়ে চাঙা হয়ে উঠল ঝিনুক। খবরটা নিশ্চয়ই কোনও একটা দিশা দেখাবে মোহিতবাবুর কেসের।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে ম্যানেজারের কেবিনে দীপকাকুর পিছু-পিছু ঢুকল ঝিনুক। কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের সামান্য কম-বেশি। চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা ল্যাপটপে কাজ করছিলেন। ঝিনুকরা ঢুকেছে টের পেয়ে উলটো দিকের চেয়ারে বসতে নির্দেশ করলেন। বসার আগেই দীপকাকু চাপা উত্তেজনায় বলে উঠলেন, "মনে হচ্ছে, ওই ফুটেজটাই দেখছেন। পেনড্রাইভে লোড করে নিয়েছেন?"

মাথা নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' বোঝালেন ম্যানেজার। তারপর নিস্তেজ গলায় বললেন, "মনে হয় না তেমন কাজে লাগবে আপনার। দেখুন।"

ঝিনুকরা ইতিমধ্যে চেয়ারে বসে পড়েছে। ম্যানেজার ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন দীপকাকুর দিকে। পাশে বসে ঝিনুক ল্যাপটপের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছে সিসি টিভির দু'টো ক্যামেরার ছবি। রিপিট হয়ে যাচ্ছে চলমান ছবির অংশ। কালার খুব একটা স্পষ্ট নয়। প্রথম ক্যামেরা হোটেলের পোর্টিকোর জোনটা ধরেছে, পরেরটা রিসেপশন এরিয়া। হেলমেট পরা অবস্থায় একজন, ফিগার দেখে ইয়াং এজ বলেই মনে হচ্ছে, হোটেলের দরজা লক্ষ করে এগিয়ে আসছে, পর মুহূর্তে নেক্সট জোনে, এগিয়ে যাচ্ছে রিসেপশন কাউন্টারের দিকে। লেডি রিসেপশনিস্টের সামনে গিয়ে কী যেন বলল। রিসেপশনিস্ট বোর্ডার এন্ট্রি রেজিস্টারে আঙুল রেখে খাতাটা ঘুরিয়ে দিল লোকটার সামনে। ঝুঁকে খাতাটা দেখল সেই ব্যক্তি। মুখ তুলে বোধ হয় থ্যাঙ্কস জানাল মহিলাকে। ঘুরে গিয়ে হাঁটা দিল। দু'টো ক্যামেরার জোন পেরিয়ে চলে গেল সে। সিসি টিভি ক্যামেরা যেহেতু উপর দিকে লাগানো থাকে, ব্যক্তিটির মুখের সামান্য অংশও দেখা গেল না। রিপিট হতে চলা চলমান ছবির মাঝে দীপকাকু হাত বাড়িয়ে ল্যাপটপের সুইচ অপারেট করতে লাগলেন। ছবিটাকে স্থির করে জুম করে নিচ্ছেন লোকটির দেহের বিভিন্ন অংশ। লোকটি পজিশন চেঞ্জ করছে, বদলে যাচ্ছে জুমিংয়ের লক্ষ। কখনও জুতো, মোবাইল ধরা হাতের মুঠো, হেলমেট, জ্যাকেট, ট্রাউজার্স। কোনও কিছুরই আসল কালার বোঝা যাচ্ছে না। স্ক্রিনে ধূসর নীল আর সাদার আধিক্য। ল্যাপটপ থেকে আঙুল তুলে নিলেন দীপকাকু। ছবি চলতে থাকল। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকে দীপকাকু বললেন, "মোটরবাইকটা জোনের মধ্যে আনেনি। নম্বর বা বাইকের মডেলটা দেখা যেত। সিসি টিভি যে আছে, জানে। জোন এরিয়াও জানা।"

"হেলমেট মাথায় দিয়ে ঢুকেছে, যাতে মুখের ছবি না ওঠে," বলল ঝিনুক।

দীপকাকু স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে ম্যানেজারের কাছে জানতে চাইলেন, "আপনার রিসেপশনিস্টের কাছে কী জানতে চাইল, জেনেছেন?"

"জেনেছি। কাউন্টারে এসে চালাকি করে বলেছে, 'মিস্টার অমল ঘোষ আজ আসছেন না। কাল সকাল সাড়ে দশটায় চেক ইন করবেন। ঘর দু'টো অন্য কাউকে বুকিং দেবেন না।' কাউন্টারের অপর্ণা বলেছে, 'মিস্টার ঘোষ তো আজ দুপুরেই চেক ইন করেছেন।' ছেলেটি অবাক হয়ে বলেছে, 'সে কী, একটু আগেই যে আমাকে ফোন করে বললেন লোকেশন দেখতে আগামী কাল আসবেন। কোন অমল ঘোষকে রুম দিলেন আপনারা? রেজিস্টার দেখি?' অপর্ণা তখনই রেজিস্টার বুক দেখায়।"

ম্যানেজার থামতেই ঝিনুক দীপকাকুর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "আপনার খবর নেওয়া হলে রিসেপশনে ফোন করেই নিতে পারত। হোটেল পর্যন্ত এল কেন?"

"আমার অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর জানতে, যার থেকে ভেরিফাই করবে আমার আইডেন্টিটি। দেখবে, 'অমল ঘোষ' নামটা ফেক কি না। সত্যিই ফিল্ম প্রোডাকশন হাউসে কাজ করি, নাকি অন্য কোনও উদ্দেশে এসেছি এখানে।"

"একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে আপনার ফোন নম্বর, অ্যাড্রেস মনে রাখতে পারবে?" অবিশ্বাসের গলায় জানতে চাইল ঝিনুক।

"মোবাইল সেটে ছবি তুলে নিয়েছে," বলে দীপকাকু ফের ল্যাপটপের সুইচ টিপে চলমান ছবির একটা অংশ স্থির করলেন, যেখানে লোকটি ঝুঁকে রেজিস্টার চেক করছে। লোকটির মোবাইল ফোন ধরা ডান হাত রেজিস্টার খাতার পাশে। হাতটা জুম করে বড় করলেন দীপকাকু। ঝিনুক দ্যাখে, সত্যিই তো ফোনসেটের ক্যামেরা লেন্স রেজিস্টারের লেখার উপর তাক করা। তার মানে মোবাইলের ক্যামেরা অন রেখেছিল, কথা বলতে-বলতে ক্লিক করেছে।

"ও মাই গড!" বলে উঠল ঝিনুক।

"দেখি, দেখি কী ব্যাপার!" ম্যানেজার ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে নিলেন নিজের দিকে। ছবি দেখে বলে উঠলেন, "ওরে বাব্বা, এ তো ডেঞ্জারাস ছেলে!"

দীপকাকুর দু' হাতের আঙুল জড়াজড়ি হয়ে এখন ঠোঁটের নীচে। বললেন, "বাই দ্য ওয়ে, আপনি দু' বার লোকটিকে 'ছেলে' বললেন। সেটা ছবির চেহারা দেখে, নাকি রিসেপশনিস্ট বলেছে আপনাকে?"

"ছবি দেখে মনে তো হচ্ছেই। অপর্ণাও সেরকমই বলল। যদিও ছেলেটার মুখ ভাল করে দেখা যায়নি, হেলমেট তো ছিলই,

সানগ্লাসও ছিল চোখে।"

"আমার আসল পরিচয় রিসেপশনিস্টকে জানাননি তো?"

"কখনওই না। শুধু বলে রেখেছিলাম, কেউ যদি অমল ঘোষের ব্যাপারে কোনও কোয়ারি করতে আসে, সবটাই যেন বলে। কোনও ক্রস কোয়েশ্চেনে না যায়।"

হোটেলে চেক ইন করেই দীপকাকু কেন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, এখন বুঝতে পারছে ঝিনুক। কেউ যে অমল ঘোষের খোঁজ করতে আসতে পারে, আন্দাজ করেছিলেন আগেই। এখন ম্যানেজারের উদ্দেশে বললেন, "পেনড্রাইভটা কাইন্ডলি যদি দেন, ফুটেজটা আমার ল্যাপটপে লোড করে নিতে পারি।"

"সার্টেনলি," বলে ল্যাপটপ থেকে পেনড্রাইভ খুলে দীপকাকুর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন ম্যানেজার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পেনড্রাইভ শার্টের পকেটে রাখলেন দীপকাকু। বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার মুখার্জি। আপনার হেল্প আবারও লাগতে পারে কিন্তু।"

আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস। বিশেষ করে খোদ লালবাজার থেকে যখন আপনাকে হেল্প করতে বলা হয়েছে," ম্যানেজারের গলায় বিনয় এবং সম্ভ্রম দু'টোই প্রকাশ পেল। দীপকাকু সৌজন্যের হাসি হেসে দরজার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। ঝিনুক বোঝে, এই কেসেও দীপকাকু লালবাজারের পুলিশবন্ধু রঞ্জনকাকুর সোর্স কাজে লাগাচ্ছেন। পূর্ণ উদ্যমে নেমে পড়েছেন তদন্তে।

সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠতে-উঠতে ঝিনুক দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "কেসটার ব্যাপারে কী বুঝছেন?"

আরও দু' ধাপ সিঁড়ি ভেঙে দীপকাকু উত্তর দিলেন, "অপরাধী ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়নি। আমরা ঠিক কী কারণে ময়ূরবাড়িতে গিয়েছিলাম, খোঁজ নিচ্ছে।"

"যে ছেলেটা এসেছিল, সে-ই কি অপরাধী? নাকি তাকে পাঠানো হয়েছে খোঁজ নিতে?"

প্রশ্নটার কোনও উত্তর দিলেন না দীপকাকু। এক মনে সিঁড়ি ভাঙছেন।

॥ ৩ ॥

ঝিনুক, দীপকাকু এখন আসানসোলের মুনশি বাজারে। গীতা জুয়েলার্স-এর উলটো দিকে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে। দীপকাকু মন দিয়ে দোকানটা লক্ষ করছেন। এটাই গোরাচাঁদ স্যাকরার দোকান। এখানেই মুকুটটা নিয়ে এসে নকল কি আসল যাচাই করেছিলেন মোহিতবাবু। ম্যানেজারের ঘর থেকে দোতলায় উঠে করিডরে দাঁড়িয়ে মোহিতবাবুকে ফোন করেছিলেন দীপকাকু। বললেন, "গোরাচাঁদ স্বর্ণকারের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। উনি যেহেতু জানেন মুকুটটা নকল, আমার আসল পরিচয় এবং কী উদ্দেশ্যে এখানে আসা, বলা যেতেই পারে। আপনি দোকানের অ্যাড্রেস দিন। ভদ্রলোককে ফোন করে বলে দিন, আমি যাচ্ছি।"

দীপকাকুর কথায় সম্মত হয়েছিলেন মোহিতবাবু। ফোনের কথা বেশিক্ষণ গড়ায়নি। দু'টো দোকানের অ্যাড্রেস জানিয়েছেন মোহিতবাবু। একটা সিন্দুকের দোকানের, অন্যটা গীতা জুয়েলার্সের। এর পরই দীপকাকু-ঝিনুক, যে যার রুমে গিয়ে বাইরে বেরনোর পোশাক পরে নেয়। হোটেল থেকে বেরিয়ে আসার আগে দীপকাকু ডাইনিংয়ে বসে বিকেলের চা সন্ধেবেলায় খেলেন আর ভেবে গেলেন আকাশপাতাল। সেই চিন্তার ছাপ এখনও রয়েছে মুখে। গয়নার দোকানটার দিকে এত মনোযোগ দিয়ে কী দেখার আছে বুঝতে পারছে না ঝিনুক। সাবেকি দোকান, গদির উপর বসে আছেন মালিক, যেমন পুরনো দোকানগুলোয় দেখা যায়। ওঁর বুক পর্যন্ত কাচের শোকেস। ধরে নেওয়া যায় ইনিই গোরাচাঁদবাবু। সামনে দু'জন কাস্টমার, তাঁরাও বসে আছেন গদি বা কারপেটে। কথাবার্তা চলছে নিবিষ্ট ভাবে। দাঁড়িয়ে থেকে পা ধরে গিয়েছে ঝিনুকের। ধৈর্য হারিয়ে পেন্ডিং একটা প্রশ্ন করেই ফেলে দীপকাকুকে, "আচ্ছা, মোহিতবাবুর কাছে আপনি একবার জানতে চেয়েছিলেন মুকুটটা পরীক্ষা করাতে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন, স্বর্ণকারের বাড়িতে না দোকানে? উনি বলেছিলেন, দোকানে। এই কেসে মুকুট পরীক্ষার জায়গাটা দেখা জরুরি নাকি স্বর্ণকার গোরাচাঁদবাবুর সঙ্গে কথা বলা?"

"দু'টোই! জায়গাটা বাড়ি হলে সমস্যা হত। স্পেস বেশি। স্বর্ণকার পরীক্ষা করার সুযোগে মুকুটটা যদি বদল করে থাকে, হিসেব মেলাতে বেগ পেতে হত।"

দীপকাকুর কথায় রীতিমতো নাড়া খায় ঝিনুক। সবিস্ময়ে বলে ওঠে, তার মানে! গোরাচাঁদবাবুই অপরাধী? আসল মুকুটটা হাত সাফাই করে নকল ধরিয়ে দিয়েছেন মোহিতবাবুকে!"

"হতে পারে। সুযোগ আছে। দোকানের ভিতরটা দেখে, মালিকের সঙ্গে কথা বলে খানিকটা আন্দাজ করতে পারব," থামলেন দীপকাকু।

ঝিনুকের চোখ যায় দোকানের দিকে, কাস্টমার দু'জন বেরিয়ে যাচ্ছে। দীপকাকু বললেন, "চলো, যাই এবার।"

রাস্তা ক্রস করে ঝিনুকরা ঢুকল গীতা জুয়েলার্সে। বছর পঁয়তাল্লিশের গোরাচাঁদবাবুর মুখে সেল্‌সম্যানসুলভ অভ্যর্থনার হাসি। দীপকাকু সবে বলেছেন, "মোহিতবাবু..."

"বুঝেছি, বুঝেছি। আসুন," বলে বিনয়ের সঙ্গে বসার জায়গা নির্দেশ করলেন গোরাচাঁদবাবু।

কাস্টমার দু'জন যেখানে বসেছিল, ঝিনুকরা বসল সেখানেই। দীপকাকু শার্টের পকেট থেকে কার্ড বের করে এগিয়ে দিলেন গোরাচাঁদবাবুকে, যে কার্ডে দীপকাকুর আসল পরিচয় দেওয়া আছে। কার্ডটা অনেকক্ষণ ধরে পড়লেন গোরাচাঁদবাবু, মুখে ফুটে উঠেছে সম্ভ্রম। বোঝাই যাচ্ছে জীবনে প্রথম কোনও গোয়েন্দার কার্ড হাতে নিয়েছেন। যত্নের সঙ্গে সেটা রেখে দিলেন শোকেসের নীচের তাকে। উপর থেকে শুধু একটা তাক দেখা যাচ্ছে, যেখানে সাজানো আছে নানা ধরনের অলঙ্কার। এমন হওয়া আশ্চর্যের নয়, মোহিতবাবু যখন মুকুটটা পরীক্ষা করাতে নিয়ে এসেছিলেন, সেটা হয়তো আসলই ছিল, গোরাচাঁদ নকলটা রেখেছিলেন শোকেসের নীচের তাকে। মোহিতবাবুকে কোনও ভাবে অন্যমনস্ক করে আসল নকলের জায়গা বদলে করে দেন তিনি। আসল মুকুট এখন গোরাচাঁদবাবু পিছনের ছোটখাটো সিন্দুকটায় আছে... ঝিনুকের ভাবনার মাঝে গোরাচাঁদ বলে ওঠেন, "বলুন স্যার, আমার কাছে কী জানতে চান?"

দীপকাকু ঘাড় ঘুরিয়ে দোকানের চারপাশটা দেখছিলেন। গোরাচাঁদবাবুর প্রশ্নে সংবিৎ ফিরল। বললেন, "আপনি তো জানেন মোহিতবাবুদের কালীপ্রতিমার সোনার মুকুট খোয়া গিয়েছে।"

"খোয়া গিয়েছে কি না সঠিক ভাবে জানি না। মোহিতবাবু আমার কাছে যে মুকুটটা নিয়ে এসেছিলেন, সেটা নকল। এটা জানার পর মোহিতবাবু বললেন, 'আসলটা তা হলে চুরি হয়েছে।' আমি যতটুকু যা জেনেছি মোহিতবাবুর থেকে, সত্যি-মিথ্যের দায়িত্ব নিতে পারব না," বললেন গোরাচাঁদবাবু। প্রথম দিকের বিনয় ভঙ্গি এখন আর চেহারায় নেই। সতর্ক হয়ে হিসেব করে কথা বলছেন।

দীপকাকু বললেন, "ঠিক আছে, তাই না হয় হল। এবার বলুন তো, মোহিতবাবুদের মুকুটটা হাতে নিয়েই কি আপনি টের পেয়েছিলেন, ওটা নকল? নাকি কষ্টিপাথর দিয়ে পরীক্ষা করার পর?"

"হাতে নিয়েই বুঝেছিলাম। কত বছর হয়ে গেল এই লাইনে আছি। স্কুলে পড়তে-পড়তে কাজ শিখেছি বাবার কাছে। মোহিতবাবুর বিশ্বাসের জন্য কষ্টিপাথরে মুকুটের একটা কোণ ঘষেছি। অ্যাসিড দিয়ে পাথরটা মোছার পর দেখা গেল কোনও সোনার দাগ নেই।"

গোরাচাঁদবাবুর কথার পিঠে দীপকাকু বললেন, "নাইট্রিক অ্যাসিড। গোল্ডের সঙ্গে কোনও রিঅ্যাকশন হয় না।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন গোরাচাঁদবাবু। দীপকাকু ফের প্রশ্নে গেলেন, "আপনি নিশ্চয়ই এ বছর কালীপুজোয় মোহিতবাবুদের মন্দিরে গিয়েছিলেন, তখন কি প্রতিমার মুকুটটা দেখে কোনও খটকা লেগেছিল? আপনার তো অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ চোখ।"

"ঠিকই বলেছেন। আমাদের মতো লোকের দশ হাত দূর থেকে সোনার জল করা জিনিস দেখে খটকা লাগার কথা। মোহিতবাবুর বাড়ির পুজোয় প্রত্যেকবারের মতো এবারেও গিয়েছিলাম। তবে দু'টো কারণে আমার মনে কোনও প্রশ্ন জাগেনি এক, মায়ের গয়নার দিকে আমি লক্ষই করিনি, ভক্তিভরে মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর মুকুটটাও পাকা হাতে তৈরি। মোটা দাগের কাজ হলে চোখ আপনিই টেনে নিত।"

"এরকম নিখুঁত কাজ করার মতো দোকান এই অঞ্চলে ক'টা আছে?"

"আমারটা ছাড়া আর একটাও নেই বলতে পারেন। আর দুর্গাপুরে বেনাচিতিতে শ্রীগুরু জুয়েলার্সের পক্ষে সম্ভব।"

গোরাচাঁদবাবুর সাহস দেখে অবাক হয় ঝিনুক, সন্দেহের পঞ্চাশভাগ নিজের দিকে টেনে নিচ্ছেন।

"কলকাতাতেও তো বানানো যেতে পারে," বললেন দীপকাকু।

"সে তো অবশ্যই। কলকাতায় এমন সব দোকান আছে, এক সপ্তাহের মধ্যে ডেলিভারি দিয়ে দেবে।"

"তার জন্য তো জিনিসটা কারিগরকে দেখাতে হবে?"

"নিশ্চয়ই। না দেখে সে করবে কী করে! শুধু দেখলে হবে, জিনিসটা সামনে রেখে নকল বানাবে।"

"হুম," বলে চুপ করে গেলেন দীপকাকু। ঝিনুক প্যাড, পেন বের করে ইমপর্ট্যান্ট পয়েন্টগুলো নোট করতে থাকে। ছোটখাটো পয়েন্ট অনেক সময় ভুলে যান দীপকাকু, যখন-তখন জিজ্ঞেস করে বসেন ঝিনুককে। হোমওয়ার্ক রেডি রাখাই ভাল। পয়েন্টস চোখের সামনে থাকলে ঝিনুকেরও কেস ফলো করতে সুবিধে হয়। বাবাকেও জানাতে হয় তদন্তের ধাপগুলো। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে দীপকাকু গোরাচাঁদবাবুকে বললেন, "আসল মুকুটটা কি কখনও আপনার হাতে নিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে?"

উত্তর দিতে সময় নিচ্ছেন গোরাচাঁদবাবু। মাথা নামিয়ে নিয়ে আবার তুললেন। চোখ-মুখে ইতস্তত ভাব। দীপকাকু বললেন, "কী হল, বলুন? আপনি যদি কোনও তথ্য গোপন করার চেষ্টা করেন, কেস সল্‌ভ হলে চোর যে-ই হোক, আপনিও খানিকটা দায়ী থেকে যাবেন আইনের চোখে।"

মৃদু শাসানিতে কাজ হল। মুখ খুললেন গোরাচাঁদবাবু, "আসলে ব্যাপারটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। হয়তো বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে মোহিতবাবুর প্রতি। কোর্টকাছারির কথা যখন উঠছে, বলেই ফেলি। একবার বিজনেসের কারণে মোহিতবাবুর অনেক টাকা দরকার পড়েছিল। উনি আমার কাছে ধার চাইলেন। এত টাকা ধার আগে কখনও চাননি। আমি বললাম, এই পরিমাণ টাকা আমি মর্টগেজ ছাড়া দিতে পারব না। উনি মন খারাপ করে ফিরে গিয়েছিলেন। পরের দিন কালীমা'র মুকুট নিয়ে হাজির। বললেন, 'এটা তো সারা বছর আমার সিন্দুকেই থাকে, তোমার সিন্দুকে রেখে দিয়ে টাকা দাও। পুজোর আগে টাকা শোধ করে মুকুটটা নিয়ে যাব। আমার একটাই অনুরোধ,

ঘটনাটা তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকে জানিও না। মান যাবে আমার।'"

টানা কথা বলে দম নিতে থামলেন গোরাচাঁদবাবু।

ব্যগ্র কণ্ঠে দীপকাকু জানতে চাইলেন, "মুকুটটা রেখে টাকা ধার দিলেন?"

"দিলাম টাকা। তবে মুকুটটা আধঘণ্টা, বড় জোর পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি রাখতে পারিনি। মুকুটটা রেখেছিলাম এই সিন্দুকেই," বলে পিছনের সিন্দুকটা দেখালেন গোরাচাঁদবাবু। ফের বলতে থাকলেন, "মোহিতবাবুর সঙ্গে আড্ডা আমার ভালই জমে। নানা বিষয়ে কথা হয়। সেদিন আড্ডা জমছিল না। খালি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। বারবার মনে হচ্ছিল, এত বড় পাষণ্ড হয়ে গেলাম! মায়ের গয়না বন্ধক রেখে টাকা ধার দিচ্ছি! মা কালী কিছুতেই আমায় ক্ষমা করবেন না। স্কুলের পরীক্ষা থেকে শুরু করে জীবনে যখনই কোনও বড় কাজে হাত দিতে গিয়েছি, মোহিতবাবুদের মন্দিরে গিয়ে মাথা ঠেকিয়ে এসেছি।"

"পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই মোহিতবাবুকে মুকুটটা ফেরত দিয়ে দিলেন। টাকাটা যেমন দিয়েছিলেন, তেমনই রইল, ইন্টারেস্টের এগেনস্টে লোন?"

"হ্যাঁ। টাকা যে ধার নিলেন, কোর্ট পেপারে লিখিয়ে রেখে দিলাম নিজের কাছে। যেমন প্রত্যেকবার করি। সেবার অনেক টাকা চেয়েছিলেন বলেই মর্টগেজের প্রসঙ্গে এসেছিল।"

গোরাচাঁদবাবুর কথা শেষ হওয়ার পর সেকেন্ড খানেক ভেবে নিয়ে দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "মোহিতবাবু যে ক'বার আসল এবং নকল মুকুট সমেত দোকানে বসে কথা বলেছেন, আপনার কোনও কর্মচারীর সেসব শুনে ফেলার সুযোগ ছিল কি?"

"না, ওই ধরনের প্রাইভেট কথা বলার আগে আমি কর্মচারীদের সরিয়ে দিই। কাউন্টারে কর্মচারী বড় একটা কেউ থাকেও না। দোকানের সব কর্মচারীই আমার কারিগর, পিছনের ঘরে কাজ করে। চা-টা আনানোর হলে ওদের দিয়েই...," বলে থমকে গেলেন গোরাচাঁদবাবু। জিভ কেটে বললেন, "দেখেছেন, আপনারদের জন্য চা বলতে ভুলে গিয়েছি।" পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে কাউকে বুঝি চা নিয়ে আসার কথা বলতে যাচ্ছিলেন, দীপকাকু বললেন, "এখন দরকার নেই চা। খেয়ে বেরিয়েছি।"

উঠে পড়লেন দীপকাকু। দেখাদেখি ঝিনুকও। গোরাচাঁদবাবু একটা কার্ড বার করে দীপকাকুর উদ্দেশে তুলে ধরে বললেন, "দোকানের কার্ড। আমার মোবাইল নম্বরও আছে। যদি প্রয়োজন পড়ে ডিরেক্ট ফোন করবেন। মায়ের মুকুটটা মোহিতবাবু আমার কাছে বন্ধক রাখতে এসেছিলেন, কথাটা যে আপনি আমার থেকে জেনেছেন, মোহিতবাবুকে সেটা না জানালে আমার পক্ষে ভাল হয়।"

দোকানের কার্ড শার্টের পকেটে রেখে দীপকাকু বললেন, "কথা দিতে পারছি না। প্রয়োজন পড়লে বলতেই হবে। তবে মোহিতবাবু যদি ফোন করে জিজ্ঞেস করেন আমার সঙ্গে আপনার কী কথা হল? আপনি একটি কথাও জানাবেন না। বলবেন, আমি বারণ করেছি। মোহিতবাবু ছাড়া আমার এখানে আসার কারণটাও কেউ যেন না জানে।"

নিরীহ মুখে ঘাড় কাত করলেন গোরাচাঁদবাবু। দীপকাকু দোকান থেকে বেরনোর জন্য পা বাড়ালেন।

ঝিনুকরা মুনশি বাজার গীতা জুয়েলার্সে এসেছিল রিকশায় চেপে। দোকান থেকে বেরনোর পর দীপকাকু রিকশার দিকে তাকাচ্ছেন না, রাস্তার ধার ধরে এক মনে হেঁটে যাচ্ছেন। সিগারেট ধরিয়েছেন। ইদানীং স্মোক কমই করেন। মাথায় খুব চাপ পড়লে তবেই। ঝিনুক দীপকাকুর পাশে, কখনও বা পিছনে হেঁটে চলেছে। কোনও প্রশ্ন করার সাহস পাচ্ছে না। সত্যি বলতে কী, কেসটা এমন পেঁচিয়ে যাচ্ছে, প্রশ্নটা কী হবে, খুঁজে পাচ্ছে না সেটাই। ফুলস্লিভ শার্ট, জিন্‌স পরে আছে ঝিনুক। তবু বেশ শীত-শীত করছে। দীপকাকুর আবার হাফহাতা শার্ট। রাস্তার দু' পাশে আলো ঝলমলে দোকানে শীতের পোশাক শোভা পাচ্ছে, দু'জনের জন্য একটা করে জ্যাকেট কেনার কথা দীপকাকুকে বলবে কিনা ভাবছে ঝিনুক, দীপকাকু হঠাৎ বলে উঠলেন, "গোরাচাঁদবাবুর পক্ষে আসল মুকুটটা হাতানোর সম্পূর্ণ সুযোগ আছে।"

শীত ভুলে তদন্তে মন চলে আসে ঝিনুকের। জিজ্ঞেস করে, "কীভাবে হাতাতে পারেন?"

চিন্তামগ্ন গলায় দীপকাকু বলতে থাকলেন, "ওই আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে কাজের কাজটা করে নিয়েছেন। যেবার মুকুট বন্ধক রেখে টাকা ধার নিতে এসেছিলেন মোহিতবাবু। হয়তো সিন্দুক খুলেও মুকুটটা ঢোকাননি, পাশে লুকিয়ে রেখেছিলেন। পিঠ দিয়ে গার্ড করে রেখেছিলেন মোহিতবাবুকে। ওই অবস্থাতেই কোনও কর্মচারীকে চা আনতে বলেন। না জেনেই কর্মচারীটি মোহিতবাবুর সামনে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। গোরাচাঁদবাবু মুকুট হাতে নিয়ে উঠে যান পিছনের ঘরে। কোনও কর্মচারীকে বলেন মুকুটটার ফোটো তুলে এবং মাপজোক নিয়ে রাখতে। ফিরে আসেন মোহিতবাবুর সামনে। ফের কোনও ছুতোয় পিছনের ঘরে গিয়ে হাতে করে লুকিয়ে নিয়ে আসেন মুকুটটা। ফেরত দেন মোহিতবাবুকে। ততক্ষণে নকল বানানোর জন্য যতটুকু যা প্রয়োজন হাসিল হয়ে গিয়েছে," থামলেন দীপকাকু। পরক্ষণেই বলে উঠলেন, "এটা একটা উদাহরণ মাত্র। এই গোত্রের কোনও একটা পদ্ধতি নিয়ে থাকতেই পারেন।"

"নকলটা করে রাখার কারণ?" জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু বললেন, "গোরাচাঁদবাবু জানেন মোহিতবাবুর ব্যবসার যা হাল, পরে আবার লোন চাইতে আসবেন মুকুট নিয়ে। তখনই হাত সাফাই করে আসলের বদলে নকলটা ধরিয়ে দেবেন।"

"কিন্তু মোহিতবাবু তো নকল মুকুট নিয়ে এসেছিলেন," খেয়াল করায় ঝিনুক।

"হয়তো আসলটাই নিয়ে এসেছিলেন। ওটা নকল, এই সন্দেহটা পুজোর সময় মোহিতবাবুর মাথায় কেউ ঢোকায়। সেই ব্যক্তি গোরাচাঁদের লোকও হতে পারে।"

এই পয়েন্টটা খুব একটা যুক্তিযুক্ত মনে হল না ঝিনুকের। বলে ওঠে, "পুজোকালীন এই সন্দেহটা যদি কেউ মোহিতবাবুর কানে দিয়ে থাকে, মানে সে হয়তো বলল, 'মুকুটটা এমন অনুজ্জ্বল লাগছে কেন?' মোহিতবাবু সেই ব্যক্তির উল্লেখ অবশ্যই আমাদের সামনে করতেন। তা ছাড়া যে মানুষটা এত বছর ধরে জিনিসটা নাড়াচাড়া করেছেন, বাইরের কারও কথায় প্রভাবিত হয়ে আসলকে নকল বলে সন্দেহ হবে না। সত্যিকারের খটকা লেগেছিল, ওজনে ভারী মনে হয়েছিল বলে তিনি গোরাচাঁদবাবুর কাছে নিয়ে আসেন মুকুটটা।"

"ঠিকই বলেছ, এই পয়েন্টটায় এসে গোরাচাঁদবাবুর উপর সন্দেহটা ফিকে হয়ে যায়।"

"মোহিতবাবুকে কি আপনি এখন সন্দেহের বাইরে রাখছেন?"

"একেবারেই না। বরং অবিশ্বাস বাড়ছে। বাড়ির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অলঙ্কার বন্ধক রাখতে যে মানুষের বাধে না, তিনি বিজনেস বাঁচাতে মুকুটটা বিক্রি করতেও পিছপা হবেন না। নিজের দোষ ঢাকতে এবং সম্মান বাঁচাতে নকলটা বানিয়েছেন। গোরাচাঁদবাবুকে সাক্ষী রেখেছেন সেই মুকুটের। আমাদের কেন নিয়োগ করেছেন আগেই বলেছি।"

আগের পয়েন্টটা মনে করে নিয়ে ঝিনুক বলল, "উনি যদি মাঝপথে আমাদের তদন্ত বন্ধ করতে বলেন, আপনি মেনে নেবেন?"

দীপকাকুর কাছ থেকে কোনও উত্তর এল না। আরও বেশ কয়েক পা হেঁটে যাওয়ার পর স্বগতোক্তির ঢঙে বলে উঠলেন, "ছেলেটি কে?"

"কোন ছেলে?" অবাক হয়ে জানতে চায় ঝিনুক।

"সিসি টিভির ফুটেজের ছেলেটা।"

নিজের মাথায়ই চাটি মারতে ইচ্ছে করে ঝিনুকের, এত তাড়াতাড়ি হেলমেটওলাকে ভুলে গেল! আসলে মোহিতবাবু আর গোরাচাঁদবাবুকে নিয়ে ভাবনা এমন পেঁচিয়ে গিয়েছে, ছেলেটা চলে গিয়েছিল ট্র্যাকের বাইরে। দীপকাকু নিজেকে শোনানোর মতো করেই বলতে থাকলেন, "ছেলেটিকে কে পাঠাল? মোহিতবাবু পাঠাবেন না। যে নাম, ঠিকানায়

আমি হোটেলে উঠেছি, উনি সবই জানেন। নিজের উপর থেকে সন্দেহ ঘোরাতেই কি ছেলেটাকে অ্যাক্টিং করতে পাঠিয়েছেন?"

"আপনার ওই ফল্‌স নাম-ঠিকানা লিক হলে মোহিতবাবুর থেকেই হবে। একমাত্র উনিই জানেন, আপনি কোন নাম, ঠিকানায়, কোন হোটেলে উঠেছেন," বলল ঝিনুক।

"ঠিক বলেছ। উনি অ্যাক্টিংয়ের জন্য কাউকে পাঠাবেন না। জানেন, প্রথম সন্দেহ আমি ওঁকেই করব," একটু থামলেন দীপকাকু। ফের বললেন, "গোরাচাঁদবাবুও লোক পাঠানোর মতো বোকামি করবেন না। যে পদ্ধতিতে চুরির কথা আমি বলেছি, অনেকটা ওই ভাবেই যদি মুকুটটা হাতিয়ে থাকেন গোরাচাঁদবাবু, কাজ নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করেছেন। অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন। এখন লোক পাঠিয়ে খোঁজ নেওয়ানো মানে, খাল কেটে কুমির ডাকা। সেই লোকের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি গোরাচাঁদবাবুর কাছে পৌঁছব। ঝুঁকিটা কেন উনি নিতে যাবেন?"

"অপরাধীর মন! সব সময় সংশয়ে ভুগছেন। এই বুঝি ধরা পড়ে যাবে! সেই ভয় থেকেই হয়তো খোঁজ নিচ্ছেন, ময়ূরবাড়িতে যারা এসেছে, তারা আসলে কারা? মোহিতবাবুর বাড়ির লোক, যারা এতক্ষণে জেনে গিয়েছে আপনার মিথ্যে নাম, ঠিকানা, কোন হোটেলে উঠেছেন, রুম নম্বর, সব তথ্য সাপ্লাই করেছে গোরাচাঁদবাবু।"

ঝিনুকের কথা শেষ হওয়ার আগে থেকেই মাথা নাড়ছেন দীপকাকু। বলে উঠলেন, "না-না, অত দুর্বল মনের মানুষ গোরাচাঁদবাবু নন। তেমন হলে উনি কিছুতেই বলতেন না নকল মুকুটটার মতো সূক্ষ্ম কারুকাজ আমি আর দুর্গাপুরের একটা দোকান করার ক্ষমতা রাখে। উনি হয় প্রচণ্ড সাহসী, নয়তো খুব সৎ।"

এই পয়েন্টটা ঝিনুক আগেই খেয়াল করতে পেরেছে বলে মনে-মনে খুশি হয়। সন্দেহের অর্ধেক অবলীলায় নিজের পক্ষে টেনে নিয়েছিলেন গোরাচাঁদবাবু। এখন ঝিনুক বলে উঠল, "তা হলে কি আপনি তৃতীয় কোনও ব্যক্তির অস্তিত্বের কথা ভাবছেন?"

"ভাবছি। হয় সে মোহিতবাবুর আশপাশে থাকা লোক, অথবা দূর থেকে মোহিতবাবুর কাছের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। তবে সে যে-ই হোক, আর কিছুক্ষণের মধ্যে তার একটা ক্ষীণতম হদিশ আমরা পাব।"

"কী করে?"

ঝিনুকের প্রশ্ন শুনতে পেলেন না দীপকাকু, নাকি এড়িয়ে গেলেন বোঝা গেল না। আঙুল তুলে বললেন, "ওই দ্যাখো আমাদের হোটেল। কী রকম রাস্তা চিনে এলাম, বলো!"

গুরুদায়িত্বহীন ছোটখাটো সাফল্যে দীপকাকু এরকমভাবেই বাচ্চাদের মতো খুশি প্রকাশ করে ফেলেন। এই মানুষটাই কত দুর্বোধ্য সমস্যা সমাধান করার পর থাকেন অদ্ভুত নির্লিপ্ত।

আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর ঝিনুকরা যখন জি টি রোড ছেড়ে ডিউক হোটেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ঝিনুকের চোখ কেড়ে নিয়েছে হোটেল বিল্ডিংয়ের গায়ে রঙিন বাল্‌বের আলোকসজ্জা, হঠাৎ শোনা গেল দীপকাকুর চাপা গম্ভীর গলা, "বি কেয়ারফুল।"

সংবিৎ ফিরতেই ঝিনুক দেখে হেলমেট পরা একটা বাইক আরোহী হোটেলের গেট থেকে তাদের লক্ষ করে এগিয়ে আসছে। স্নায়ু টানটান হয়ে ওঠে ঝিনুকের। থেমে যায় পা। দীপকাকুও দাঁড়িয়ে পড়েছেন। সেই ছেলেটাই কি? দীপকাকু ওরফে অমল ঘোষের খোঁজ নিতে এসেছিল রিসেপশনে?

ঝিনুকদের সামনে এসে দাঁড়াল বাইক। আরোহী হেলমেট খুলতে দেখা গেল মোহিতবাবুর নাতি সুবর্ণ। জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা সিডি বার করে দীপকাকুর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, "দাদু পাঠাল। আমাদের পুজোর ছবি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ," বলে দীপকাকু সিডিটা নিয়ে ঝিনুককে রাখতে দিলেন। সুবর্ণর বোধ হয় আরও কিছু বলার আছে, মুখটা গম্ভীর। দু' বার সাক্ষাতে যা মনে হচ্ছে, ছেলেটা সিরিয়াস প্রকৃতির। বলে উঠল সুবর্ণ, "সিডিটা রিসেপশনে রেখে যেতে পারতাম। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে বলেই ওয়েট করে গেলাম।"

"বলো কী কথা?" মার্জিত স্বরে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

সুবর্ণ বলল, "আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আপনারা শুটিংয়ের লোকেশন দেখতে আসেননি। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে এসেছেন।"

"এরকম মনে হওয়ার কারণ?" দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন।

বাইকে বসে মাটিতে এক পা রেখে কথা বলছে সুবর্ণ। এখন বলল, "কলকাতার দশ-বিশ কিলোমিটার রেডিয়াসে আমাদের মতো বাড়ি অনেক পাওয়া যাবে। আপনারা কী কারণে এত দূর উজিয়ে এলেন এবং এসে দাদুর ঘরে বসে কথা বলে গেলেন টানা? ঘরদোর ঘুরে দেখলেনই না। কী বিষয়ে কথা হল জানতে পারি কি?"

মাথা নিচু করে কিছু একটা ভেবে নিলেন দীপকাকু। মুখ তুলে বললেন, "কী নিয়ে কথা হল বলে তোমার মনে হয়? আন্দাজ যদি সঠিক হয়, আমি স্বীকার করে নেব।"

দীপকাকুর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুবর্ণ বলতে থাকল, "অনুমান যদি করতেই পারব, জিজ্ঞেস করছি কেন আপনাকে? এটুকু বলতে পারি, বাড়ির অন্দরমহলে বাইরের লোকের আনাগোনা দাদু কোনওকালেই পছন্দ করেন না। এখন হঠাৎ শুটিংয়ের জন্য বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন দেখে বেশ আশ্চর্য হচ্ছি।"

"কালীপুজোর সময় তো তোমাদের বাড়িতে লোক সমাগম হয়," বললেন দীপকাকু।

"বাড়ির ভিতরে হয় না। ভিড় যা হয় বাড়ির মাঠে, মন্দির ঘিরে। সিডিটা দেখলেই বুঝতে পারবেন," থামল সুবর্ণ। (এবার একটু নরম গলায়) ফের বলে ওঠে, "আসলে দাদুকে নিয়ে আমরা বেশ চিন্তায় আছি। কিছুদিন যাবৎ দাদুকে ভীষণ রেস্টলেস দেখাচ্ছে। মেজাজ থাকছে উঁচু পরদায়। বেসিক্যালি দাদু কিন্তু অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার মানুষ। কী হয়েছে, জানতে চাইলে, আমাদের কিছু বলছেন না। তাই ভাবলাম আপনাদের যদি কিছু বলে থাকেন। অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতেই হয়তো ডেকেছেন আপনাদের।"

মন দিয়ে কথাগুলো শুনে দীপকাকু বললেন, "আমরা কিন্তু সত্যিই লোকেশন দেখতে এসেছি। কলকাতার কাছেপিঠে, এমনকী, খোদ কলকাতাতেও তোমাদের মতো বাড়ি অবশ্য পাওয়া যায়। তার ভাড়া কিন্তু প্রচুর। বাজেট কন্ট্রোল করতেই প্রাথমিক ভাবে তোমাদের বাড়িটা বেছেছি। সুমিতাভ, সম্পর্কে সম্ভবত তোমার কাকা, আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এখানকার বাড়ির ফোটো ওর কাছেই দেখেছিলাম। সুমিতাভর রেফারেন্স নিয়ে এসেছি তোমার দাদুর কাছে। বাড়িটা যেহেতু কোনওদিন শুটিংয়ের জন্য ভাড়া দেননি মোহিতবাবু, রেটটা ঠিক করা নিয়েই সকালে অতক্ষণ ধরে আলোচনা হল।"

থামলেন দীপকাকু। সুবর্ণর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন কতটা কনভিন্সড হল সে। ঝিনুকের তো মনে হচ্ছে, হয়নি। ফের দীপকাকুই বলে উঠলেন, "এমন হতে পারে, তোমাদের ব্যবসায় টাকার প্রয়োজন পড়েছে, সেই কারণেই মোহিতবাবু রাজি হচ্ছেন বাড়িটা শুটিংয়ের জন্য ভাড়া দিতে। তা ছাড়া আমি খুব একটা অচেনা বা বাইরের লোক নই। সুমিতাভর বন্ধু। আমি আসছি, জানিয়ে সুমিতাভ ফোনও করেছে তোমার দাদুকে।"

অবলীলায় মিথ্যেটা বলে দিলেন দীপকাকু। একটু ভেবে নিয়ে সুবর্ণ বলল, "আমি যত দূর জানি, বিজনেসে এখন সেরকম কোনও ক্রাইসিস নেই। তবে এ ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাল জানে অভিজিৎ।"

"কে অভিজিৎ?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

উত্তরটা সুবর্ণকে দিতে দিল না ঝিনুক। নোট সে এমনি রাখে না। বলে উঠল, "অভিজিৎ হচ্ছে ম্যানেজার শশাঙ্কবাবুর ছেলে। বিজনেসের হিসেবপত্র দ্যাখে।"

সুবর্ণ অবাক হয়ে তাকাল ঝিনুকের দিকে। দীপকাকুও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, দৃষ্টিতে প্রশংসা নেই, আছে চাপা ধমক। কেন, ধরতে পারল না ঝিনুক।

কিক মেরে বাইক স্টার্ট দিল সুবর্ণ। হেলমেট পরার আগে বলল, "দাদুর বয়সটা নিয়েই চিন্তা। দিনের পরদিন টেনশন চেপে রাখা এই শরীরের পক্ষে মোটেই ভাল নয়।"

এগিয়ে গেল সুবর্ণর বাইক। ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে দীপকাকু বললেন, "অভিজিৎকে প্লেস করতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। ভান করছিলাম না-চেনার। তুমি আগ বাড়িয়ে পরিচয়টা বলতে গেলে কেন! সুবর্ণ বুঝে গেল শুটিং সংক্রান্ত কথা ছাড়াও তার দাদুর সঙ্গে আরও অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শেষের কথাগুলো বলে বুঝিয়ে দিল, আমাদের সে মোটেই বিশ্বাস করেনি।"

মনটা খুবই দমে গেল ঝিনুকের। নিজের কাজ দেখানোর আগে পরিস্থিতিটা বিচার করা উচিত ছিল। দীপকাকু এখনও সুবর্ণর যাওয়ার রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে অবশ্য অনেক আগেই চলে গিয়েছে চোখের বাইরে। দীপকাকু বলে উঠলেন, "সুবর্ণকে কি সম্ভাব্য অপরাধী হিসেবে ধরা যায়?"

খানিক আগের উষ্মা উধাও হয়েছে দীপকাকুর গলা থেকে। ঝিনুক সাহস করে বলে উঠল, "সুবর্ণই কি সকালে রিসেপশনে এসেছিল খোঁজ নিতে? ড্রেস তো প্রায় একই দেখছি।"

"সেটা এখনই চেক করে নিচ্ছি।"

"কীভাবে?"

"একটু আগে সুবর্ণ তো সিডি নিয়ে গিয়েছিল রিসেপশনে। এখনকার সিসি টিভি ফুটেজের সঙ্গে সকালের ফুটেজ মেলাব। দেখব, দু'টো ছবিতে ছেলেটার হাঁটার ধরন এক কি না? যমজদেরও হাঁটার স্টাইলে কিছু না-কিছু তফাত থাকে।"

"সুবর্ণ যদি দু' বার দু' রকম ভাবে হাঁটে?"

"এত সতর্ক সে এখনই হবে না। আমার আসল পরিচয় ওর কাছে অজানা। হোটেলে চেক ইন করার পর আমার খোঁজে কেউ আসতে পারে, ধরে নিয়ে আমি ম্যানেজারকে সেই আগন্তুকের ফুটেজ সরিয়ে রাখতে বলব, এতটা কল্পনা করা তার পক্ষে অসম্ভব," বলে ঘুরে দাঁড়ালেন দীপকাকু। হোটেলের গেট লক্ষ করে পায়ে-পায়ে এগোতে থাকলেন। ঝিনুকও চলল পাশে-পাশে।

॥ ৪ ॥

আজ সকালে রুমের বেল টিপে ঝিনুকের ঘুম ভাঙিয়েছেন দীপকাকু। তখন প্রায় সাড়ে আটটা। বেড থেকে ব্ল্যাঙ্কেট সুদ্ধ নেমে এসে ডোর ওপেন করেছিল ঝিনুক। সকালের দিকে পুরোমাত্রায় শীত। দীপকাকু বলেছিলেন, "তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। ব্রেকফাস্ট সেরে ময়ূরবাড়ি যাব। হ্যান্ডিক্যামটা নিতে ভুলো না। লোকেশন দেখার নামে বাড়ির ভিতর-বাইরেটা ক্যামেরাবন্দি করে নিতে হবে। পরে ভাবতে খুব সুবিধে হয়।"

ফোটো দেখে ভাবনাচিন্তা করার অ্যাডভান্টেজ কাল রাতে পুরোপুরি অনুভব করেছে ঝিনুকরা। সুবর্ণর দিয়ে যাওয়া সিডিটা দীপকাকুর ল্যাপটপে চালিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখা হয়েছে মোহিতবাবুদের গত কালীপুজোর মুভিং ফোটো। দীপকাকুর ল্যাপটপে এডিটিংয়ের সফটওয়্যার ইনস্টল করা আছে। চলমান ফোটো স্থির করে দরজার মতো জুম করেছিলেন দীপকাকু। মূলত দেখা হচ্ছিল মুকুটটা চুরি যাওয়ার কী-কী সুযোগ আছে? আর খেয়াল করা হচ্ছিল, ভক্তদের বডি মুভমেন্ট, এক্সপ্রেশন। কেউ কি তাক করে আছে মূর্তির প্রতি? সন্দেহ করার মতো কিছুই পাওয়া গেল না। একবারই শুধু মুকুটটা চোখের আড়ালে গিয়েছিল, ভোগ নিবেদনের সময়। দেবীর সামনে মহিলারা এনে রাখলেন খিচুড়ি, পায়েস, নানাবিধ ব্যঞ্জন। একে-একে মন্দিরের ঘরটা, দীপকাকুর ভাষায় গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁরা। পুরোহিত ভোগের পাত্রগুলো আরও একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে বেরোলেন সকলের শেষে। দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিলেন দেবীর ঘরের। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পঞ্চপ্রদীপের আলোয় আরতি করতে লাগলেন। তুমুল জোরে বাজতে লাগল কাঁসার ঘণ্টা, ঢাক। ক্যামেরা ঘুরতে লাগল পুরোহিতের হাতে ধরা পঞ্চপ্রদীপে, ঢাকে, কাঁসরে। বাদক, পুরোহিত এবং ভক্তদের মুখে। মোহিতবাবুকেও চোখ বুজে বুকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এই সময় যে ক্যামেরা অপারেট করছিল, পাকা হাত। বেশিরভাগ সময় অ্যামেচার হাতে তোলা হয়েছে ফোটো। ভোগ নিবেদন ঠিক কতক্ষণ চলেছিল বোঝা না গেলেও, আরতি শেষ হওয়ার মুহূর্ত, শিকল খুলে পুরোহিত মশাইয়ের ভিতরে যাওয়া, আলো জ্বালানো, যে মহিলারা ভোগের পাত্র রেখেছিলেন ভিতরে, তাঁরা এবং পুরোহিত মশাইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট মিলে ভোগ প্রসাদ বাইরে বার করতে থাকলেন, সবই দেখা গেল। ভোগ আরতির মাঝের কিছুটা সময় এডিট করে বাদ দেওয়া হয়েছে, দৃশ্যটার তো কোনও বৈচিত্র নেই তেমন। সিডিটা যে দেখবে খামোকা বোর হবে। তবু ঝিনুক বলেছিল, "মাঝের সময়টুকু থাকলে ভাল হত কি?"

দীপকাকু বলেছিল, "নাঃ, ওই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই দরজা খোলা হয়নি," একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "দরজা বন্ধ অবস্থায় চুরি করতে হলে জানলা থাকা দরকার। গর্ভগৃহে ক্যামেরা পুরোটাই ঘুরেছে, জানলা তো চোখে পড়ল না। জল, বাতাস যাতায়াতের জন্য নালা, ঘুলঘুলি থাকবেই, ক্যামেরায় সেগুলো আসেনি। গিয়ে দেখতে হবে।"

ঝিনুক ভেবে পায়নি নালা বা ঘুলঘুলির মতো ছোট ছিদ্র দিয়ে কীভাবে মুকুটটা বের করা সম্ভব! পুজোর অনেক অকিঞ্চিৎকর উপকরণকে জুম করে দেখছিলেন দীপকাকু। কেন দেখছেন, ভাবার চেষ্টাও করেনি ঝিনুক, অত বুদ্ধি তার ঘটে নেই। মোক্ষম জুমিংটা হয়েছিল মুকুটটা প্রতিমার মাথা থেকে খোলার সময় মোহিতবাবুর মুখে। দীপকাকু বলে উঠেছিলেন, "দেখেছ, এক্সপ্রেশনের কোনও চেঞ্জ নেই। অথচ বলেছিলেন, 'মুকুটটা হাতে নিয়ে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল আমার।' কই, তার তো কোনও ছায়া নেই চোখ-মুখে। নাকি মানুষটা অভিব্যক্তি গোপন করার ব্যাপারে অত্যন্ত পটু?"

ঝিনুক কোনও মন্তব্য করেনি। এমনিতেই তার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল, কাজ করছিল না মাথা। দীপকাকু গোড়া থেকে দেখা শুরু করলেন সিডিটা। স্বল্প বিরতিতে দু' বার হাই তুলে ফেলে ঝিনুক। দীপকাকু বলেছিলেন, "যাও, রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

"ইট্‌স অলরাইট। ঠিক আছি," বলেছিল ঝিনুক।

দীপকাকু বলেছিলেন, "না, না, শুয়ে পড়ো। সারাদিন অনেক ধকল গিয়েছে তোমার। আমি কতক্ষণ জাগব, কোনও ঠিক নেই।"

ঝিনুক ফিরে এসেছিল রুমে। বিছানায় সোজা হতে না-হতেই ঘুমে কাদা। বাবাকে রাতে ফোন করবে বলে রেখেছিল, সে আর হয়নি। বাবা নিশ্চয়ই দীপকাকুকে ফোন করে নিয়েছেন। গীতা জুয়েলার্স থেকে হোটেলে ফিরেই বাড়িতে ফোন করেছিল ঝিনুক। মাকে "ঠিক আছি," জানিয়ে বাবাকে বলেছিল, "ইনভেস্টিগেশন ভালই এগোচ্ছে, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেশ কিছু স্টেপ এগিয়ে যাব, তখনই একসঙ্গে জানাব ফোনে।"

"তাই করিস," বলে ফোন রেখেছিলেন বাবা। বাড়ির ফোনের পর তদন্তের দু'টো ধাপ পেরিয়েছেন দীপকাকু। রিসেপশনে আসা সুবর্ণর ফুটেজ চেয়ে নিয়ে সকালের ছেলেটার সঙ্গে মিলিয়েছেন, হাঁটার ধরনে কোনও মিল নেই। দু'জনের পোশাক এক। রং বোঝার উপায় নেই এদের সিসি টিভিতে। এতেও সুবর্ণকে সন্দেহের বাইরে রাখা যাচ্ছে না। সকালের ছেলেটা হয়তো তারই পাঠানো। গীতা জুয়েলার্স থেকে ফেরার পথে দীপকাকু যে বলেছিলেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যে অপরাধীর ক্ষীণতম হদিশ পাবেন। সেটাও পেয়েছেন। তবে বড়ই ক্ষীণ! সূত্র দিয়েছেন লালবাজারের রঞ্জনকাকু। দীপকাকু কলকাতার যে ছদ্ম ঠিকানা লিখেছেন হোটেলের রেজিস্টারে। তা রঞ্জনকাকুর দেওয়া। ওই প্রোডাকশন হাউসের সঙ্গে রঞ্জনকাকুর খাতির আছে। হাউসের রিসেপশনে বলে রেখেছিলেন, কেউ যদি ফোন করে জিজ্ঞেস করে অমল ঘোষের ব্যাপারে। বলবে, আসানসোলে গিয়েছেন, লোকেশন দেখতে। কলারের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাবে, রেকর্ড করবে ভয়েস। রেখে দেবে কলারের নম্বর। ভয়েস রেকর্ড করার সুযোগ হয়নি। কলার শুধু একটা বাক্যই বলেছিল, "কী ব্যাপার,

অমল ঘোষ তো এখনও চেক ইন করলেন না হোটেলে?"

"আর কিছুক্ষণের মধ্যেই করবেন। পৌঁছে গিয়েছেন আসানসোলে। আপনি কে বলছেন?" প্রোডাকশন হাউসের রিসেপশনিস্টের প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই ফোন ছেড়ে দিয়েছিল কলার। শুধু তার নম্বরটা পাওয়া গেল। রঞ্জনকাকু ফোন কোম্পানিকে নম্বরটা দিয়ে লোকেশন জানতে বলেছিলেন। লোকেশন জানিয়েছে কোম্পানি, আসানসোলের কালীপাহাড়ি অঞ্চলের একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ। কাল রাতে ফোনে রঞ্জনকাকুর থেকে ইনফরমেশনটা নেওয়ার পর ঝিনুককে জানিয়েছিলেন দীপকাকু। ঝিনুক হতাশ হয়ে বলেছিল, "পিসিও-র নম্বর ধরে তো অপরাধীর টিকিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

দীপকাকু বলেছিল, "তা হলেও একটা কথা আবার প্রমাণ হল, অপরাধী আছে নাগালের মধ্যেই। এটাই আমাকে কেসটা নিয়ে কাজ করতে ইনস্পায়ার করছে।"

আজ ভোরে উঠে দীপকাকু ফোনবুথটা দেখে এসেছেন। উষাগ্রাম, মানে মোহিতবাবুদের বাড়ি ছাড়িয়ে গিয়ে কালীপাহাড়ি মোড়ে কাচ ঘেরা একলা দাঁড়িয়ে থাকা সরকারি পিসিও বুথ। এই ধরনের বুথ আজকাল কলকাতায়ও চোখে পড়ে না। কে কখন ফোন করে যাচ্ছে, সাক্ষী দেওয়ার মতো আশপাশে থাকে না কেউ। তদন্তের স্বার্থে ফোনবুথটা তেমন কাজে না লাগলেও, স্পটটা না দেখার জন্য আফশোস হচ্ছে ঝিনুকের। ইনভেস্টিগেশনের কোনও ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকতে চায় না সে। ঘুম থেকে না ডাকার জন্য দীপকাকুকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি তো আর ঝিনুককে নিয়ে এক্সকারশনে বেরোননি যে, সব ব্যাপারে ডেকে নিতে হবে। ঝিনুকের রেডি থাকা উচিত ছিল। এখন ময়ূরবাড়ি যাওয়ার জন্য ডেকে নেওয়াটাই সৌভাগ্য বলতে হবে।

হোটেলে ব্রেকফাস্ট সেরে অটোয় চেপে ময়ূরবাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে ঝিনুকরা। শীত আটকানোর জন্য পোলোনেক টিশার্টের উপর ফুলহাতা শার্ট চাপিয়েছে ঝিনুক। তবু অটোর সিটে কুঁকড়ে বসে রয়েছে। দীপকাকু এখনও হাফহাতা শার্ট, চিন্তার জগতে চলে গেলে শীত, গ্রীষ্মের ফিলিংসটা বোধ হয় ওঁর চলে যায়।

ময়ূরবাড়ির গেটে পৌঁছে গেল অটো। নেমে এসে ভাড়া মেটালেন দীপকাকু। গেটের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ালেন। মাথা তুলে কী যেন দেখছেন! গেটের মাথায় ময়ূর দু'টোকে? আবার এগোলেন, ফের দাঁড়ালেন! এবার প্যান্টের পকেট থেকে বের করলেন মিনি বাইনোকুলার। সাইজে ছোট কিন্তু পর্যায়ক্রমে ময়ূর দু'টোকেই দেখছেন। তদন্তের সঙ্গে সিমেন্ট বাঁধানো ময়ূরের কী সম্পর্ক বুঝে উঠতে পারছে না ঝিনুক। এরই মধ্যে ঝিনুকের চোখে পড়ে সাইকেল গড়িয়ে গেটের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দু' কাঁধে ফেরতা দেওয়া চাদর পরা লোক। আর একটু কাছে আসতে দেখা গেল, চাদর পরার স্টাইলটা পুরনো হলেও, মানুষটা ইয়ং। বয়সে সুবর্ণর চেয়ে কিছুটা বড় হবে। ঝিনুকদের সামনে থামাল সাইকেল। হ্যান্ডেলে দু'টো নাইলনের ব্যাগ। মাছ, সবজির বাজারে যাবে মনে হয়। ছেলেটার উপস্থিতি এখন টের পাননি দীপকাকু। বাইনোকুলার দিয়ে এখনও দেখে যাচ্ছেন নিষ্প্রাণ ময়ূর দু'টোকে। ঝিনুক গলা ঝাঁকি দেয়। কাজ হয় না কোনও। চশমা পরা ছেলেটার চোখে-মুখে আলগা কৌতূহল। দীপকাকুর উদ্দেশে বলে উঠল, "সিনেমায় কাজে লাগাবেন নিশ্চয়ই গেটটা। ময়ূর বসানো দরজা তো একেবারে রেয়ার।"

মাথা নামালেন দীপকাকু। দূরবিন পুরলেন পকেটে। ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ময়ূরবাড়ির লোক বলে মনে হচ্ছে, মুখে জিজ্ঞেস করতে পারছেন না পরিচয়। প্রশ্নটা দৃষ্টিতে ঝুলিয়ে রেখেছেন দীপকাকু। চট করে বুঝে নিয়ে সৌজন্যের সঙ্গে ছেলেটি বলল, "আমি অভিজিৎ রক্ষিত। ময়ূরবাড়ির ম্যানেজার শশাঙ্ক রক্ষিতের ছেলে।"

বয়সে অনেকটা ছোট বলে দীপকাকু নমস্কারের দিকে গেলেন না। হাসিমুখে নিজের ছদ্ম পরিচয় দিতে যাবেন, অভিজিৎ বলল, "বড়বাবু আপনাদের সম্বন্ধে আমাকে সব বলেছেন। কবে থেকে শুরু করবেন শুটিং?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে দীপকাকু কপাল কুঁচকে জানতে চাইলেন, "আচ্ছা অভিজিৎ, খুব বেশি বছর হয়নি না, ময়ূর দু'টো গেটের মাথায় লাগানো হয়েছে?"

উৎসাহ পেল অভিজিৎ। প্রশংসার গলায় বলে উঠল, "এই হচ্ছে সিনেমা লাইনের লোকের চোখ! একদম ঠিক ধরেছেন, বছর তিনেক হয়েছে ময়ূর দু'টো বসানো হয়েছে গেটের মাথায়," একটু থেমে অভিজিৎ ফের বলল, "আসলে হয়েছে কী, এ বাড়িতে দু'টো ময়ূর ছিল। ওদের ঘর থাকলেও, রাতটুকু বাদে ছাড়াই থাকত। কখনও পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে যেত বাইরে। ফিরেও আসত। একবার ফিরল না।"

"অ্যাক্সিডেন্ট? গাড়ি চাপা পড়ল জি টি রোডে?" কথার মাঝে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

মাথা নাড়ছে অভিজিৎ। বলল, "অ্যাক্সিডেন্ট ঠিকই, তবে গাড়ি চাপা পড়ে নয়। আপনারা হয়তো জানেন আসানসোলের এই অঞ্চলটায় অনেক বেআইনি কয়লাখনি আছে। তারই কোনও গর্তে পড়ে গিয়ে থাকবে।"

"ইস," আক্ষেপটা অটোমেটিক্যালি ঝিনুকের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

অভিজিৎ বলে যাচ্ছে, "ওই ময়ূর দু'টোর কারণেই বাড়িটার নাম ময়ূরবাড়ি হয়ে গিয়েছে লোকমুখে। ওদের চলে যাওয়ার সঙ্গে বাড়ির নামটাও যাতে ভুলে না যায় লোকে, সেই ভেবেই বড়বাবু গেটের মাথায় দু'টো সিমেন্টের ময়ূর বসানোর ব্যবস্থা করেন।"

দীপকাকুর আন্দাজটাই মিলল, এরা ময়ূর পুষত বলেই বাড়ির এই নাম। প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে দীপকাকু বাড়তি বিনয়ে অভিজিৎকে বললেন, "মোহিতবাবুর কাছে জেনেছি ওঁদের বিজনেসের হিসেবপত্র সব তুমিই দেখাশোনা করো। আমাদের একটা ব্যাপারে একটু হেল্প করবে প্লিজ।"

"বলুন, কী হেল্প করতে পারি?"

"আসলে আমাদের তো খুব স্মল বাজেটের ছবি, এই বাড়িটা বাছাটাও সেই কারণে। চেনাজানার মধ্যে, ভাড়াটা যদি বাজারের তুলনায় সস্তা হয়। কিন্তু মোহিতবাবু তো রেট বেশ চড়া বলছেন। তুমি কি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কম করতে পার না? নয়তো এ বাড়িতে শুটিং করার আশা ছেড়েই দিতে হবে আমাদের।"

নিপুণভাবে কথাগুলো বানালেন দীপকাকু, সংগতি রেখে ঝিনুকও মুখটা দুঃখু-দুঃখু ভাব করে। অভিজিৎ উত্তর দিতে সময় নিচ্ছে। বলে উঠল, "দেখুন, আমার রিকোয়েস্টে উনি কিছু করবেন বলে মনে হয় না। সুমিতাভকাকু তো আপনার বন্ধু। ওঁকে দিয়ে বলালে কাজ হলেও হতে পারে। আমি শুধু আপনাকে এটুকু বলতে পারি, এঁদের বিজনেসের অবস্থা অ্যাট প্রেজেন্ট মোটেই ভাল যাচ্ছে না। টাকার খুব দরকার।"

ঝিনুক অবাক। সুবর্ণ বলছে ব্যবসায় এই মুহূর্তে কোনও ক্রাইসিস নেই, অভিজিৎ বলছে উলটো! কে যে সঠিক বোঝা যাবে কী করে? যুক্তির দিক থেকে অভিজিতের কথাই মেনে নেওয়া উচিত। কারণ, বিজনেসের অ্যাকাউন্টসটা ও-ই দেখে। বড় করে শ্বাস ছেড়ে দীপকাকু বললেন, "দেখি, সুমিতাভকে দিয়ে বলিয়ে..."

"আমার দিক থেকে যদি কিছু করার থাকত, নিশ্চয়ই করতাম," ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে বলে সাইকেলে উঠল অভিজিৎ। দীপকাকু বাড়ির দিকে এগোলেন। ঝিনুক ভাবে, অভিজিৎকে কি সন্দেহের তালিকায় রাখা যায়? তদন্ত বেশ কিছু দূর না এগনো পর্যন্ত দীপকাকু সকলকেই তালিকায় রাখতে বলেন।

গতকালের মতো নীচের বৈঠকখানায় বসেছে ঝিনুকরা। মোহিতবাবু ঢুকলেন। ঠোঁটের কোণে মিটিমিটি হাসি। আশ্চর্য হয় ঝিনুক, আড়চোখে দ্যাখে দীপকাকুর কপালেও ভাঁজ পড়েছে। সিঙ্গল সোফায় বসে মোহিতবাবু বললেন, "গোরাচাঁদ নিশ্চয়ই বলে দিয়েছে, মুকুটটা বন্ধক রাখতে গিয়েছিলাম একবার।"

"আপনি কী করে জানলেন?" দীপকাকুর গলায় সচকিত বিস্ময়।

এক্সাইটমেন্ট ছুঁল না মোহিতবাবুকে। লঘু স্বরে বলতে থাকলেন, "আমার নিজের থেকেই ঘটনাটা আপনাকে জানানো উচিত ছিল। আসলে কুণ্ঠা হচ্ছিল বলতে। গোরাচাঁদ নার্ভাস প্রকৃতির লোক। আপনার গোয়েন্দা পরিচয় পেলে সবই যে গড়গড় করে বল দেবে, বুঝতেই পারছিলাম।"

উত্তর পেয়ে বোধ হয় সন্তুষ্ট হলেন দীপকাকু। ভাল করে পিঠ ঠেকালেন সোফায়। ফের মোহিতবাবুই জানতে চাইলেন, "সিডি দেখে কোনও সুবিধে হল?"

"কিছুটা হয়েছে। ওইদিনের পুরোহিতের সঙ্গে একবার কথা বলা খুব দরকার।"

মুখটা হঠাৎ যেন নিভে গেল মোহিতবাবুর। বিষণ্ণ গলায় বললেন, "পরেশ শুধু ওই দিনের পুরোহিত নয়, সারা বছরই পুজো করে আমাদের মন্দিরে। ওর মনের অবস্থা এখন ভাল নয়। কথা বলতে চাইবে কি না সন্দেহ আছে।"

"মনের অবস্থা ভাল নয় কেন?" ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলেন দীপকাকু। চুরির সঙ্গে লিঙ্ক করতে চাইলেন নিশ্চয়ই।

মোহিতবাবুর উত্তর সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন করে দিল। বললেন, "কিছুদিন হল ওর ছেলে মারা গিয়েছে অ্যাক্সিডেন্টে।"

ঘরে নেমে এল নীরবতা। শুধু গ্র্যান্ডফাদার ক্লকের টিক টিক। খানিক বিরতির পর দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "কী অ্যাক্সিডেন্ট, কবে হয়েছে?"

"কালীপুজোর পরের দিন। জি টি রোডে গাড়িতে ধাক্কা মেরেছে। সেদিন ভোরে কুয়াশা ছিল খুব।"

দীপকাকু নড়েচড়ে বসে জানতে চাইলেন, "ছেলেটি কি আপনাদের বাড়ির পুজোয় ছিল?"

"হ্যাঁ, ছিল। ভোরবেলা নিজেদের ভোগ প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। জি টি রোড ধরে। তখনই... ওর বাবা সে সময় মন্দিরে পুজো শেষের কাজ গোছাচ্ছিল।"

"আপনারদের পুজোয় ছেলেটি কি বাবাকে হেল্প করছিল? ধুতিপরা, খালি পা, পট্টবস্ত্রের চাদর গায়ে..."

ঝিনুক বুঝতে পারছে দীপকাকু সিডিতে পুরোহিতের অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে ছেলেটিকে মেলাচ্ছেন। মোহিতবাবু বললেন, "হ্যাঁ, রাজু ছিল চর্চক, মানে হেল্পার। আমাদের বাড়ির সরস্বতী, লক্ষ্মী, সত্যনারায়ণ আরও নানা বড় পুজোয় পরেশকে সাহায্য করত সে। যেমন, এক সময় পরেশ করত তার বাবাকে!"

"এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা, কেসটা বলার সময় বলেননি কেন আমাকে?" বিরক্তি গোপন করতে পারলেন না দীপকাকু।

মোহিতবাবু বললেন, "চুরির সঙ্গে ওই দুর্ঘটনার যোগাযোগটা কোথায়? অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে আমার বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে। পুলিশ, পোস্টমর্টেম সবই হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার কাছে কেউ কোনও প্রশ্ন করতে আসেনি।"

দীপকাকু নিজেকে সামলে নিয়েছেন। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "পরেশবাবুর বাড়িটা কোথায়? ওঁর সঙ্গে কথা বলতেই হবে আমাকে।"

"বাড়ি এখান থেকে তিন মাইল দূরে ডামড়াগ্রামে। কথা বলুন, কিন্তু নিজের গোয়েন্দা পরিচয় আর মায়ের মুকুট চুরির ঘটনাটা না বললেই ভাল হয়। মানসিক চাপে পড়ে যাবে বেচারা। ছেলের শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। নিত্যপুজোয় রোজই চণ্ডীমণ্ডপে আসে। কথাবার্তা একেবারেই বলে না।"

"পরিচয় না দিয়ে যদি কাজ চলে, দেব না," আশ্বস্ত করে দীপকাকু বললেন, "আসল মুকুটটার কোনও ফোটো আছে আপনার কাছে?"

"ছবির কী দরকার, নকলটা তো হুবহু আসলের মতোই। প্রয়োজন বুঝলে ওটাই নিন।"

"না, আমার আসল মুকুটের ফোটোই দরকার। আলাদা করে কি তোলা হয়েছিল কখনও?"

ঝিনুক বুঝতে পারছে না আসল মুকুটের ফোটো এত জরুরি কেন?

মোহিতবাবু বললেন, "মুকুটের ইনশিওরেন্স করানোর প্রসঙ্গ যখন উঠেছিল, খানকতক তোলা হয়েছিল ফোটো।"

"ইনশিওরেন্সের জন্য ফোটো লাগবে কেন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

মোহিতবাবু বললেন, "ইনশিওরেন্স এজেন্ট বিধান, লোকাল ছেলে, সুবর্ণর বন্ধু। আমাদের ফ্যামিলির এবং বিজনেসের বিমার কাজ সব ও-ই করে। মুকুটের জন্য ইয়ারলি কত প্রিমিয়াম লাগতে পারে, একটা আন্দাজ চেয়েছিলাম। বলল, জিনিসপত্র ইনশিওরেন্সের ব্যাপারে ওর অত এক্সপিরিয়েন্স নেই। ওর সিনিয়ারকে নিয়ে এসে একবার দেখাবে। আমি রাজি হইনি।"

"কেন?" প্রশ্ন রাখলেন দীপকাকু।

"আসলে খুব বেশি প্রিমিয়াম দিতে হলে পারব না তো পলিসিটা করাতে। টানাটানি লেগেই আছে বিজনেসে। খামোকা অফিসার র‍্যাঙ্কের একজনকে ডেকে এনে 'না' বলাটা বড় অস্বস্তির ব্যাপার।"

"ফোটো তোলার কথাটা উঠল কেন?" সূত্র ধরিয়ে দিলেন দীপকাকু।

মোহিতবাবু বললেন, "বুদ্ধিটা ঠিক কে দিয়েছিল এখন আর মনে নেই। সুবর্ণ কিংবা অভিজিৎ হবে। বলেছিল, মুকুটের একটা ফোটো তোলা হোক। ফোটোর সঙ্গে ওজনটা জানিয়ে দিলে অফিসার একটা আন্দাজ দিতে পারবেন। ফোটো তোলা হয়েছে, আমার কাছেই আছে। গড়িমসি করে বিধানকে ওটা আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি।"

"ফোটো তোলা নিয়ে আলোচনার সময় আর কে-কে ছিল?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

"আমি, বিধান, সুবর্ণ, অভিজিৎ আর আমার ছেলে দিবাকর।"

উত্তর শুনেই সোফা থেকে উঠে পড়লেন দীপকাকু। বললেন, "আপনাদের মন্দিরের ভিতরটা একবার দেখতে হবে। ততক্ষণ ফোটোগুলো বের করে রাখুন, এসে নিচ্ছি।"

"শুধু চণ্ডীমণ্ডপ তো নয়, ঘরদালান সব কিছুরই ফোটো তোলার প্রহসন করতে হবে আপনাদের। বাড়ির লোকেদের বিশ্বাস করাতে হবে আপনারা সিনেমার কাজেই এসেছেন," মনে করিয়ে দিলেন মোহিতবাবু।

ঝিনুক কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার ব্যাগ থেকে হ্যান্ডিক্যাম বার করে নিল। মোহিতবাবু ফের বললেন, "সব ঘুরেফিরে দোতলায় আমার ঘরে চলে আসুন। ফোটো রেডি রাখছি আমি।"

## ॥ ৫ ॥

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ময়ূরবাড়ির গেট থেকে শুরু করে বাউন্ডারির ভিতর যা কিছু আছে, মুভি ক্যামেরাটা দিয়ে ফোটো তুলে গেল ঝিনুক। একেবারে প্রফেশনাল স্টাইলে লুক থ্রু করেছিল। ফোটো তোলার শুরুতেই দীপকাকু বলেছেন, "হেলাফেলা করে তুলো না, পরে কাজে লাগবে ফুটেজটা।"

ময়ূরবড়ির বাসিন্দারা তাদের দেখছিল খুবই কৌতূহলভরে। মোহিতবাবুর বড় ছেলে দিবাকরবাবু এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। শর্ট হাইট, গোলগাল চেহারা, বাবার সঙ্গে কোনও মিল নেই। মায়ের ধরন পেয়েছেন হয়তো। সিনেমা প্রোডিউসের ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে চাইলেন, "মোটামুটি কত টাকা ইনভেস্ট করতে লাগে, রিটার্ন আসার সম্ভাবনা কেমন?" দীপকাকু উত্তর দিতে-দিতে চারপাশটা অবজার্ভ করে যাচ্ছিলেন নিজের মতো। সিনেমায় ইনভেস্টের ইচ্ছে জানিয়ে সঙ্গ ছাড়লেন দিবাকরবাবু। এ বাড়িতে দু'টো বাচ্চা আছে, তাদের সঙ্গে দেখা হল না। সম্ভবত স্কুলে গিয়েছে।

মন্দিরের গর্ভগৃহে গিয়ে দেখা গেল ছিদ্র বলতে দু'টোই, নালা এবং ঘুলঘুলি। দু'টো জায়গা ভাল করে পরীক্ষা করলেন দীপকাকু। ঘুলঘুলিটা দেখলেন ঠাকুরঘরে রাখা টুলের উপর উঠে। "কী দেখছেন?" জানতে চাইলে, বলছিলেন, "সম্প্রতি ভাঙাভাঙি করে সিমেন্টিং করা হয়েছে কিনা দেখছি।"

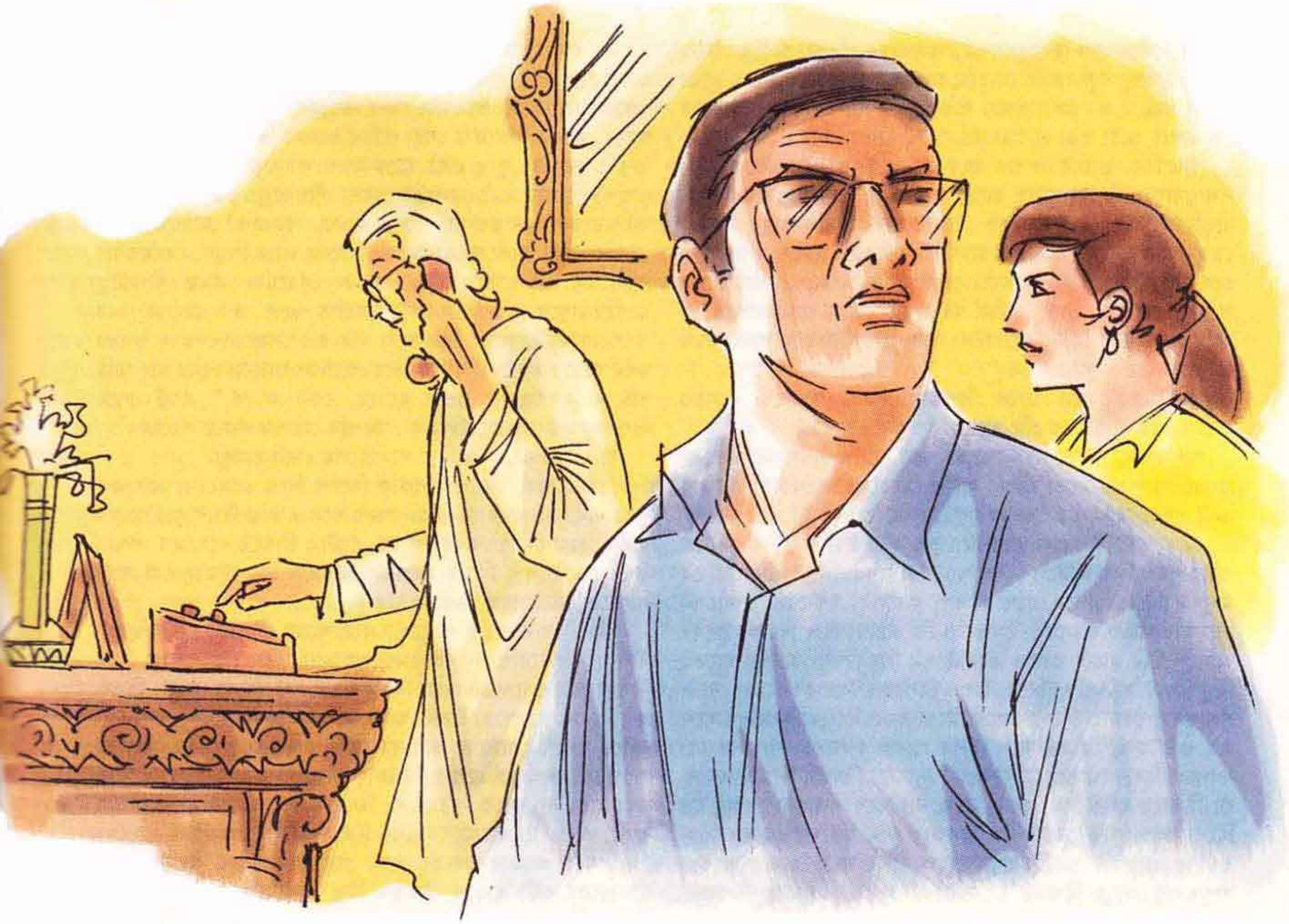

সে রকম কোনও লক্ষণ বা চিহ্ন পাওয়া গেল না। ঘুরতে-ঘুরতে ঝিনুকরা চলে এসেছে মোহিতবাবুর দোতলার ঘরে। গতকাল যে দু'টো চেয়ারে বসেছিল, আজও সেখানেই বসেছে তারা। মোহিতবাবু কাঠের কালো আলমারিটা খুলেছেন আসল মুকুটের ফোটো বের করার জন্য। খুঁজতে হচ্ছে একটু। পেলেন অবশেষে। খাম হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছেন। দীপকাকুর বডি ল্যাঙ্গোয়েজে টানটান প্রতীক্ষা।

খাম থেকে বেরোল তিনটে ফোটো। একটা মুকুটের বিগ ক্লোজআপ, দ্বিতীয়টা টেবিল টপের রাখা মুকুট, টেবিলটা চেনা যাচ্ছে, এখন যেটা ঝিনুকদের হাঁটু বরাবর। তৃতীয় ফোটোটাও এই স্পটে, মোহিতবাবু বসে রয়েছেন চেয়ারে, সামনে টেবিলটার উপর চুরি যাওয়া আসল মুকুট। দীপকাকু খুব মন দিয়ে পর্যায়ক্রমে তিনটে ফোটো যেমন দেখছেন, ফোটোর খামটাও উলটে-পালটে দেখে যাচ্ছেন। খামে এত কী দেখার আছে, ধরতে পারছে না ঝিনুক! যে স্টুডিয়ো থেকে ফোটোগুলো প্রিন্ট করানো হয়েছে, তার নাম-ধাম ছাপা আছে ওতে।

ফোটো তিনটে এনভেলপের ভিতরে ঢুকিয়ে দীপকাকু বললেন, "খামটাও আমার কাছে রইল।"

"থাক। খাম নিয়ে আমি কী করব!" অবাক হওয়া গলায় বললেন মোহিতবাবু।

উঠে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন দীপকাকু। বলে উঠলেন, "এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমেই আপনাদের পুরোহিত পরেশবাবুর বাড়ি যাব। সঙ্গে যদি কাউকে একটু দেন, বাড়িটা চিনিয়ে নিয়ে যাবে।"

এবার আর পরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল না মোহিতবাবুকে। বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দেখি, কাকে পাওয়া যায়।"

ইন্টারকম রাখা টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন মোহিতবাবু। দীপকাকু ঘরের চারপাশে চোখ বোলাচ্ছিলেন। বাঁ পাশের দেওয়ালে দৃষ্টি স্থির হল। মোহিতবাবুর উদ্দেশে বলে উঠলেন, "ঘরের ক্যালেন্ডারটা দেখছি ইনশিওরেন্স কোম্পানির! এটা কি আপনাদের সেই বিধানের কোম্পানি?"

ফোনের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন মোহিতবাবু। মুখ না ঘুরিয়ে বললেন, "ঠিক ধরেছেন। বিধান প্রত্যেক বছর মনে করে ওদের কোম্পানির ক্যালেন্ডারখানা দেয়। ইনশিওরেন্স কোম্পানির ক্যালেন্ডার বেশ কোয়ালিটির হয়, কী বলুন?"

দীপকাকু কোনও উত্তর করলেন না। ঠায় তাকিয়ে আছেন ক্যালেন্ডারের দিকে। রিসিভার তুলে ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন মোহিতবাবু।

॥ ৬ ॥

ঝিনুকরা ময়ূরবাড়ির গাড়িতে চেপে চলেছে ডামড়া গ্রামে। গাড়ি ছাড়াও শশাঙ্কবাবুকে সঙ্গে দিয়েছেন মোহিতবাবু। ড্রাইভার পুরোহিতের বাড়ি চেনে, তবুও ম্যানেজার শশাঙ্কবাবুকে পাঠানোর কারণ, দীপকাকুকে ইন্ট্রোডিউস করানোটা জোরালো হবে। নয়তো পরেশবাবুর মনের এখন যা অবস্থা, হাঁকিয়ে দিতে পারেন ঝিনুকদের।

খানিক আগেই জি টি রোড ছেড়ে মাটির রাস্তায় নেমেছে গাড়ি, ধুলো উড়ছে প্রচণ্ড। দু' পাশে ধু ধু করছে মাঠ। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছেন শশাঙ্কবাবু। ঝিনুকরা পিছনে। মোহিতবাবুর থেকে

নির্দেশ পেয়ে শশাঙ্কবাবু যখন ঝিনুকদের নিয়ে গাড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন, ময়ূরবাড়ির মোরাম রাস্তাতেই ঝাঁকুনি খাওয়ার মতো একটা খবর দেন। চাপা গলায় দীপকাকুকে বলেছেন, "আপনাদের তো মশাই শুটিং করা হবে না মনে হচ্ছে।"

স্বাভাবিক ভাবেই অবাক হয়ে দীপকাকু কারণ জানতে চান। শশাঙ্কবাবু বলেছেন, "গত রাতে ছেলের সঙ্গে মোহিতবাবুর তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা হয়েছে ঝিনুকদের নিয়ে। ছেলে দিবাকরবাবুর বক্তব্য, তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই এমন লোককে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। তাদের আবার ফোটো তোলার পারমিশনও দেওয়া হচ্ছে! পরে দেখা যাবে এরাই বাড়ির ঘাঁতঘোঁত জেনে চোর-ডাকাতদের কাছে সমস্ত খবর সাপ্লাই করে দিল। ফাঁক বুঝে নিয়ে যে-কোনও সময় ঝাঁপিয়ে পড়বে লুঠেরার দল।"

কথাগুলো শুনে নিয়ে দীপকাকু আহত-গাম্ভীর্যে জানতে চেয়েছিলেন, "বাড়িতে বুঝি প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে?"

শশাঙ্কবাবু বলেছেন, "প্রচুর না হলেও চোর-ডাকাতদের প্রলোভিত করার মতো আছে। বাড়ির মেয়েদের আগেকার আমলের ভারী গয়না, মাকালীর সোনার মুকুট, বিজনেসের টাকা..."

এর পরই দীপকাকু একেবারে চুপ করে গিয়েছিলেন। গাড়িতে ওঠার পরও নির্বাক ছিলেন বেশ খানিকটা সময়। ঝিনুক ভাবছিল, যে মানুষটা নিজে এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। ইন্টারেস্ট দেখালেন সিনেমায় লগ্নির ব্যাপারে! সেগুলো কি অ্যাক্টিং ছিল দিবাকরবাবুর? আসলে উনি যাচাই করতে এসেছিলেন ঝিনুকদের। আগের রাতেই ঝিনুকদের অভিসন্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাবার কাছে। নাকি শশাঙ্কবাবু কোনও বিশেষ স্বার্থে মিথ্যে বলছেন? মোহিতবাবুর সঙ্গে এত কথা হল, ছেলের সঙ্গে মতবিরোধের কথা তো বললেন না! ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে ঠেকছে ঝিনুকের। বিষয়টা নিয়ে দীপকাকু কী সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, জানা যাচ্ছে না। তবে শশাঙ্কবাবু বোধ হয় মিথ্যে বলার ঝুঁকি নেবেন না। দীপকাকু মনে করলেই ছেলের সঙ্গে ঝগড়ার ব্যাপারটা মোহিতবাবুর থেকে যাচাই করে নিতে পারবেন। শশাঙ্কবাবু এটুকু নিশ্চয়ই বোঝেন। নীরবতা ভঙ্গ করে দীপকাকু একদম অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে। যাঁর বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে, ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে চাইলেন।

শশাঙ্কবাবু বলেছেন, "পুরোহিতমশাইয়ের পুরো নাম পরেশ ভট্টাচার্য। কোলিয়ারিতে চাকরি করতেন আর ময়ূরবাড়িতে বড় আয়োজনের কোনও পুজো থাকলে সাহায্য করতেন বাবাকে। বাবা অনাদি ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর মোহিতবাবুর অনুরোধে চাকরি ছেড়ে মায়ের মন্দিরের স্থায়ী পূজারি হন।"

কথা এখানে পৌঁছতে দীপকাকু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "পরেশবাবুর ছেলেও তো হেল্প করত পুজোয়, আর কী করত সে?"

শশাঙ্কবাবু জানালেন, "রাজুটার লেখাপড়ায় মাথা ছিল না। স্কুলেই পড়াশোনায় ইতি। মোহিতবাবু বিজনেসের কাজে ওকে নিয়ে নেন। চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া, মাল সাপ্লাই করতে যাওয়া, পেমেন্ট কালেকশন, এই সব ফাইফরমাশ খাটত।"

দীপকাকু তখন বলেন, "আপনারা সকলে তো মোহিতবাবুর বিজনেসের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। বেশ একটা ফ্যামিলির মতো, আপনার ছেলেও বিজনেসের অ্যাকাউন্টস দেখে..."

রাজুর সঙ্গে নিজের ছেলের তুলনাটা নির্ঘাত পছন্দ হয়নি শশাঙ্কবাবুর। সন্তান গর্বে বলে উঠেছিলেন, "আমার ছেলে বড়বাবুর কথা অবজ্ঞা করতে পারেনি বলেই হিসেবের কাজটা করছে। ওর ওতে মনও নেই, প্রয়োজনও নেই। টিউটোরিয়াল হোমে পড়িয়ে ভালই রোজগার করে। আসানসোলের সবচেয়ে বড় টিউটোরিয়াল আই টি এইচ-এ পড়ায়। সরকারি স্কুলের চাকরি ইচ্ছে করলেই পেতে পারে পরীক্ষা দিয়ে। দেবে না পরীক্ষা।"

স্বাভাবিক ভাবেই দীপকাকু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেন?"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "অঙ্ক নিয়ে পিএইচ ডি করছে। প্রোফেসর হওয়াটা ওর লক্ষ্য।"

এর পর থেকে কথা ঘুরে গিয়েছে অন্য প্রসঙ্গে, আসানসোলে চাকরির বাজার কেমন? কী-কী ধরনের বিজনেস বেশি চলে? কোলিয়ারি বেল্টে শ্রমিকরা কোন রাজ্যের বেশি? ঝিনুকের এসব খবরে কোনও ইন্টারেস্ট নেই। গাড়ির জানলা দিয়ে সে বাইরের রুক্ষ প্রকৃতি দেখছে। ধু ধু মাঠে মাঝে-মাঝে কয়লার ঢিবি, টিনের ঘর। গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে। দীপকাকু যতক্ষণ কথাবার্তা চালিয়েছেন শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে, একের পর-এক মেসেজের রিং বেজেছে তাঁর সেলফোনে। মেসেজ কিসের জানে ঝিনুক, মোহিতবাবু পাঠাচ্ছেন। উপরের ঘরের থেকে বেরনোর সময় দীপকাকু মোহিতবাবুকে বলেছিলেন, "পুরোহিত এবং ওর ছেলের আর আপনার বাড়ির বাউন্ডারির মধ্যে যার-যার সেলফোন আছে তাদের নম্বর আমার লাগবে। কাউকে দিয়ে হোটেলে পাঠালে চলবে না। আমি চাই না নম্বরগুলো চাওয়া হয়েছে, কেউ জানুক," একটু থেমে দীপকাকু জানতে চেয়েছিলেন, "আপনি মেসেজ করতে পারেন?"

ঘাড় কাত করে "জানি," বলেছিলেন মোহিতবাবু।

"ভেরি গুড," বলে দীপকাকু নির্দেশ দিয়ে এসেছেন, এক-এক করে নাম সঙ্গে নম্বর জানাতে। যাদের সঙ্গে এখনও দীপকাকুর পরিচয় হয়নি, তারা মোহিতবাবুর কে হয়, সেটাও লিখতে বলেছেন। কথার পিঠে মোহিতবাবু বিস্ময় সহযোগে জানতে চান, "রাজু তো মারা গিয়েছে, ওর নম্বরও দরকার?"

"হ্যাঁ, ওর নম্বরটাও লাগবে," বলে ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়েছিলেন দীপকাকু। নির্দেশিত সেই মেসেজগুলোই নিশ্চয়ই এতক্ষণ ধরে দীপকাকুর সেলফোনে এল। কিছুক্ষণ হল বন্ধ হয়েছে আসা। ঝিনুক শুধু একটা ব্যাপারে ভীষণ অবাক হচ্ছিল। শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে মেসেজে চোখ বুলিয়ে দীপকাকু কাকে যেন সেগুলো ফরোয়ার্ড করে যাচ্ছিলেন! দীপকাকু একা না হওয়া পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা যাবে না, কাকে পাঠাচ্ছেন? জিজ্ঞেস করলেই যে উত্তর পাওয়া যাবে, তাও নয়। ওঁর মুডের উপর নির্ভর করছে।

ডামড়া গ্রামে বোধ হয় এসে পড়ল ঝিনুকরা। অজগ্রাম নয়, চালাঘরের বাড়ি ছাড়াও, ইতস্তত কিছু পাকাবাড়িও চোখে পড়ছে। রাস্তাঘাটে মানুষজন খুব কম, বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা। শতাব্দীপ্রাচীন একতলা একটা বাড়ির সামনে থামল গাড়ি। বাড়ির গায়ে ফাটল, যার কয়েকটা থেকে গাছও বেরিয়েছে। গাড়ি থেকে তড়িঘড়ি করে নামলেন শশাঙ্কবাবু। বললেন, "আমি ভিতরে গিয়ে আগে খবর দিই।"

ঝিনুকরা এখন পুরোহিতমশাইয়ের ঘরে। বিবর্ণ দেওয়ালে ঝুলছে মালা পরানো রাজুর ফোটো। এই ঘরে একটাই চেয়ার, সেটাতে পুরোহিত পরেশ ভট্টাচার্য। ঝিনুক, দীপকাকুকে বসতে দেওয়া হয়েছে বিছানায়। শশাঙ্কবাবুকেও ঝিনুকদের সঙ্গে বসতে বলা হয়েছিল, উনি রয়েছেন দাঁড়িয়ে। পরেশবাবুর স্ত্রী অতিথিদের সঙ্গে আলাপপর্ব সেরে চলে গিয়েছেন ভিতরে। সিনেমা তৈরি করার লোক বলে দীপকাকুর পরিচয় দিয়েছেন শশাঙ্কবাবু। গলা ঝেড়ে দীপকাকু এখন বলতে শুরু করলেন আগমনের হেতু, "আমাদের সিনেমায় কালীপুজোর একটা লম্বা সিন আছে। ভিডিওতে মোহিতবাবুদের পুজোটা দেখলাম। ভোগ-আরতির শুরু এবং শেষটা থাকলেও, মাঝের অনেকটা অংশ নেই। ওই সময় কি দৃশ্যের কোনও পরিবর্তন হয়, নাকি একই রকম ভাবে আরতি চলতে থাকে?"

পরেশবাবু এমন ভাবে তাকিয়ে আছেন, বোঝা যাচ্ছে প্রশ্নটা ধরতে অসুবিধে হচ্ছে। বোঝার সুবিধের জন্য দীপকাকু ফের বললেন, "মাঝের ওই সময় পুজোর কোনও ক্রিয়াকর্ম কি থাকে? দরজা খুলে যেগুলো করতে হয়।"

এবার পরেশবাবুর দৃষ্টিতে তুমুল তাচ্ছিল্য। মানে একটাই, লোকটা তো কিছুই জানে না দেখছি! দৃষ্টি থেকে উত্তরটা পেয়ে গেলেন দীপকাকু। দরজা খোলা হয় না বা হয়নি জেনেও কনফার্ম হওয়ার জন্য প্রশ্নটা করেছিলেন। একটু নড়েচড়ে বসে গেলেন প্রসঙ্গান্তরে। অতি বিনয়ে বললেন, "আপনার কাছে মেন যে কারণে আসা, পুজোর

ডিটেল্‌স আমাদের অজানা। সিনেমায় যেহেতু সিনটা বড়, অনেক কিছু দেখাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনার হেল্প নিতে আসবে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আর স্ক্রিপ্ট রাইটার। আপনার সাহায্যের জন্য অবশ্যই আমরা পে করব। এখন আপনি যদি সম্মত...”

থেমে গেলেন দীপকাকু। পরেশবাবু দৃষ্টি নামিয়েছেন মেঝের দিকে। মুখ পাথরের মূর্তির মতো। বোঝা যাচ্ছে, দীপকাকুর প্রপোজালে মোটেই উৎসাহী নন। দীপকাকু এবার সহমর্মিতার কণ্ঠে বললেন, “জানি, এখন যা মনের অবস্থা আপনার, এই প্রস্তাবটা নিয়ে আসা উচিত হয়নি। আসলে একেবারে নিরুপায় হয়েই...”

পলক পর্যন্ত পড়ছে না পরেশবাবুর। হয়তো ভিতর-ভিতর ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। ফের কথার মোড় ঘোরালেন দীপকাকু, “যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল, ধরা পড়েছে ড্রাইভার? কী গাড়ি ছিল সেটা? লরি, প্রাইভেট কার...”

“আমি খবর নিইনি। থানাও কিছু জানায়নি,” এতক্ষণে উত্তর করলেন পরেশবাবু। গলাটা বেশ ভরাট।

দীপকাকু নিশ্চয়ই এই তথ্যগুলোই জানতে এসেছেন। এতক্ষণ ধরে সূত্র খুঁজছিলেন পয়েন্টে আসার। জিজ্ঞেস করলেন, “খবর নেননি কেন?”

“কী হবে নিয়ে? রাজু তো আর ফিরে আসবে না।”

“তবু ওই কুয়াশাজমা রাস্তায় যে লোকটা ওরকম র‍্যাশ ড্রাইভিং করল, তার শাস্তি হবে না! থানায় গিয়ে একটু তাগাদা দিন।”

ঝিনুকের চোখ ফের চলে গেল দেওয়ালের ফোটোর দিকে, ফোটোর রাজু যেন দীপকাকুর কথাগুলোই বাবাকে বলছে। পরেশবাবু বললেন, “খুনে ড্রাইভারকে যা শাস্তি দেওয়ার ভগবান দেবেন। যেমন আমাদের দিচ্ছেন। অজান্তে কোনও অন্যায় হয়তো করেছিলাম।”

“কিন্তু শাস্তি তো রাজুর সবচেয়ে বেশি হল। সে তো কোনও দোষ করেনি।”

“সে আপনি-আমি জানছি কী করে! ভগবান সব জানেন। যা ভাল বুঝেছেন, করেছেন। এখানে আপনার, আমার কারও কোনও হাত নেই।”

অটল ঈশ্বরবিশ্বাসীদের সঙ্গে তর্ক বেশি দূর এগোয় না, দীপকাকু চুপ করে গেলেন। কয়েক সেকেন্ড যেতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন পরেশবাবু। বললেন, “গোবিন্দপুরে এক যজমানের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো আছে। যেতে হচ্ছে আমাকে। আপনারা চা খেয়ে উঠবেন। চিন্তা নেই, আপনাদের কাজটা করে দেব। লোক পাঠিয়ে দেবেন।”

দরজা পেরিয়ে বাইরে চলে গেলেন পরেশ ভট্টাচার্য। বেরনোর জন্য রেডিই ছিলেন। পরনে ধুতি, ফতুয়া, গলায় নামাবলির চাদর। কাঁধে গিঁট বাঁধা লাল কাপড়ের ঝোলা।

পরেশবাবুর স্ত্রী বড় থালায় তিন কাপ চা নিয়ে এলেন। ট্রে-র ব্যবহার এ বাড়িতে বোধ হয় চলে না। শশাঙ্কবাবু পরেশবাবুর ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে বসেছেন। ঝিনুক, শশাঙ্কবাবু চা নেওয়ার পর দীপকাকু থালা থেকে কাপ তুলে নিতে-নিতে পরেশবাবুর স্ত্রীকে বললেন, “উনি যেরকম গুম মেরে আছেন, আমার মনে হয় মন হালকা করার জন্য আপনাদের কোথাও বেড়াতে যাওয়া দরকার। নিদেনপক্ষে কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি।”

থালা হাতে পিছিয়ে গিয়েছেন পরেশবাবুর স্ত্রী। কান্না ঠেলে ওঠা গলায় বললেন, “আমি তো ছেলেকে নিয়ে শোকতাপ করার সুযোগই পেলাম না। ওর অবস্থা দেখে সারাক্ষণ ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি, চুপ করে কী যে ভাবছে, ও-ই জানে!”

আঁচল তুলে চোখটা মুছে নিয়ে পরেশবাবুর স্ত্রী ফের বললেন, “ঘরে, বাইরে কারও সঙ্গেই কথা বলে না। কখনও আবার বাড়ির পিছনে ডাঙাজমিতে গিয়ে বসে থাকে। একদিন দেখলাম, গাছতলায় বসে একা-একা কাঁদছে!”

“ডাঙাজমি?” দীপকাকুর গলায় বিস্ময়সহ জিজ্ঞাসা।

চা খেতে-খেতে উত্তর দিলেন শশাঙ্কবাবু, “ডাঙাজমি বলতে যেখানে চাষবাস হয় না। খোলা মাঠ পড়ে আছে, দু’-একটা কড়া ধাতের গাছ। কম বৃষ্টি, শুকনো জমিতেও যে গাছ দিব্যি বেঁচে থাকে। এই সব জমিতেই বেআইনি খনি বেশি খোঁড়া হয়। আমাদের ও বাড়ির ময়ূর দু’টো ওরকমই কোনও খনিতে পড়ে গিয়েছে।”

“এদিককার খনিগুলোতেই কি?” এটা জানতে চাইল ঝিনুক।

পরেশবাবু বললেন, “সে আর কে দেখতে গিয়েছে! পরিত্যক্ত খনিগুলোয় জল, গ্যাস থাকতে পারে নীচে, একটা বর্ষা পার করলে জল তো থাকেই। খনির দেওয়াল ফাটিয়ে নদীর জলও ঢোকে। এক-একটা মরণ কূপ। গোরু, ছাগল, মানুষ নিরুদ্দেশ হলেই আমরা ধরে নিই খনিতে পড়ে গিয়েছে, বেখেয়ালে ছিল...”

“সেই জন্যই আমি ডাঙা জমির দিকে যেতে মানা করি। কিছুতেই শুনবে না। একলা থাকতেই ওর এখন বেশি ভাল লাগে। এই তো মাস দুয়েক হল, পিছনের মাঠ থেকে এক দল কয়লা চোর ধরে নিয়ে গেল পুলিশ,” ভীত কণ্ঠে জানালেন পরেশবাবুর স্ত্রী।

দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাদের এখানে কি চোরের উপদ্রব খুব? বাড়িতেও ঢোকে?”

“ভীষণ উৎপাত। এই তো ছেলে মারা যাওয়ার পর থানা-পুলিশ করছি, তার মাঝেই একদিন চোর পড়ল বাড়িতে। এদের কোনও দয়ামায়া নেই। সবই আশপাশের ছেলে, এ বাড়ির দুর্ঘটনার কথাও জানে।”

“বাড়ি তার মানে ফাঁকা করে দিয়ে গেল?” জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

বড় করুণ এক বিদ্রুপের হাসি হাসলেন পরেশবাবুর স্ত্রী। বললেন, “আমাদের বাড়িতে দামি কী-ই বা এমন আছে, যে চুরি করবে। রাজুর মোবাইল ফোন, রাজুর বাবার পুজোর ঝোলা, যার মধ্যে পুজোতে পাওয়া থালা-বাসন ছিল। সেগুলো নিয়ে গিয়েছে। আলমারি ভেঙেছে, টাকাপয়সা পায়নি। সামান্য টাকা যা ছিল, সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়েছিলাম আমরা। কখন কী খরচ করতে লাগে। গয়না আলমারিতে থাকে না। যতটুকু আছে, সবই আমার গায়ে। ওরা লন্ডভন্ড করেছে ঘর। খাটের তলা থেকে নিয়ে গিয়েছে খনিতে নামার টুপি, গাঁইতি। উনি তো এক সময় কোলিয়ারিতে কাজ করতেন।”

“টুপি, গাঁইতি নিয়ে কী করবে চোর?” জিজ্ঞেস না করে পারে না ঝিনুক।

শশাঙ্কবাবু বললেন, “বিরাট কাজে লাগবে ওদের। এরাই তো আবার কয়লা চুরি করতে নামবে অবৈধ খনিতে।”

দীপকাকু দরজার বাইরের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন। মুখ ফিরিয়ে পরেশবাবুর স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন, “ময়ূর দু’টো কি কখনও-সখনও এ বাড়িতে চলে আসত? যদিও মোহিতবাবুর বাড়ি থেকে এটা অনেকটা রাস্তা।”

“মাঝে-মাঝে আসত। ওঁকে পছন্দ করত খুব। পুজোর ফলপ্রসাদ খেতে পেত তো ওঁর থেকে। উনিও ভীষণ ভালবাসতেন ওদের।”

পরেশবাবুর স্ত্রীর কথা শুনে নিয়ে দীপকাকু ভাবনা মেশানো ধীর গলায় বলতে থাকলেন, “আমার মনে হয় ময়ূর দু’টো এদিকে বেআইনি খনিতে পড়ে গিয়েছে। পরেশবাবু জানেন সেটা। পুত্রশোক ভুলতে আর একটা শোকের কাছে গিয়ে বসে থাকেন। শোকতপ্ত মানুষমাত্রই এটা করে। তাতে মন কতটা হালকা হয় জানি না। আমার তো মনে হয় আরও ভারী হয়ে যায়।”

কথা বলতে-বলতে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন দীপকাকু। তার মানে এবার বেরোবেন। ঝিনুক, শশাঙ্কবাবুও উঠে পড়লেন। পরেশবাবুর স্ত্রী থালায় তুলে নিচ্ছেন তিনজনের ফাঁকা চায়ের কাপ। দীপকাকু বলে ওঠেন, “আপনাদের সান্ত্বনা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। তবু বলব, মনের জোরটাই মানুষের আসল শক্তি। আপনি যদি শক্ত হতে পারেন, পরেশবাবু খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিতে পারবেন।”

হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে দীপকাকু এগোলেন দরজার দিকে। ঝিনুক তড়িৎপায়ে অনুসরণ করল। শোকাহত মাকে বিদায়ের

সৌজন্য দেখানোর মতো মনের জোর তার নেই।

॥ ৭ ॥

আজ দুপুরে প্রথমবার এই কেসটার একটা ঝাঁঝালো প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল। হুমকির চিঠি। হোটেলের রিসেপশনে কেউ একজন দিয়ে গিয়েছে। কে দিয়েছে, কখন দিয়েছে, সিসি টিভির ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা গেল না। রিসেপশনিস্ট হঠাৎ খেয়াল করে 'অমল ঘোষ' নাম লেখা একটা অনভেলপ পড়ে রয়েছে কাউন্টারে। ঝিনুকরা দুপুরে ফিরতেই তাদের হাতে খামটা ধরিয়ে দেন লেডি রিসেপশনিস্ট। আঠা দিয়ে সাঁটা ছিল খামটার মুখ। উপর দিকটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে পড়লেন দীপকাকু। তারপর ছুটেছিলেন ম্যানেজারের ঘরে সিসি টিভির ফুটেজ দেখতে। কম্পিউটারে টাইপ করা চিঠিতে লেখা, 'কোলিয়ারি অঞ্চলে শয়তানের অজস্র মুখ। মানুষ নিরুদ্দেশ হলে এখানে খোঁজা হয় না। ধরে নেওয়া হয় শয়তানের পেটে গিয়েছে। অতএব...'

বেশ একটা হিমশীতল ভয় আছে সেনটেন্সগুলোর মধ্যে। দীপকাকুর হাবভাবে অবশ্য লেশমাত্র ভীতি দেখা গেল না। রুমে বসে দ্বিতীয়বার চিঠিটা পড়ে বলেছিলেন, "ভাষার উপর দখল আছে, অন্য কাউকে দিয়ে লেখাতেও পারে।"

লাগেজ ব্যাগের সাইড চেন টেনে চিঠিটা রেখে দিলেন দীপকাকু। ঝিনুককে বলেছিলেন, "স্নান-খাওয়া সেরে একটু রেস্ট। ফের বেরোতে হবে বিকেলে।"

রেস্ট আর হল কই! লাঞ্চ করে এসে ঝিনুক নিজের রুমে বসে ভিডিও ক্যামেরার স্ক্রিনে দেখল ময়ূরবাড়িতে তোলা ফুটেজটা। সব ঠিকঠাক উঠেছে কি না আর সন্দেহজনক যদি কিছু চোখে পড়ে। ফোটো খারাপ ওঠেনি, মনে খচখচ করছে একটা ব্যাপার, বেশির সময় ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে ময়ূরবাড়ির দুই পাহারাদারের কোনও না-কোনও একজনের ফোটো। দূরে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে তারা। ফোটো তোলার সময় ঝিনুক ওদের লক্ষ করেছে, পাত্তা দেয়নি। ভেবেছিল, অনেকেই তো ফোটো তোলা হচ্ছে দেখলে সরল উচ্ছ্বাসে ফ্রেমের মধ্যে থাকতে চায়, এরা হয়তো তেমনই। কিন্তু ক্যামেরার স্ক্রিনে বারংবার ওদের উপস্থিতি দেখে মনে হল, ওরা বোধ হয় নজর রাখছিল ঝিনুকদের। কারও নির্দেশ ছিল কি? দিবাকরবাবুর কথাই প্রথমে মাথায় আসে। দীপকাকুকে বিষয়টা জানাতে হবে। এর পরই বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলল ঝিনুক। তদন্তের পর্যায়ক্রম সমস্তটাই জানাল।

হুমকির চিঠির অংশে এসে বাবা একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "দীপঙ্কর ব্যাপারটা লাইটলি নিলেও, তুই নিস না। এখনও অপরাধী দীপঙ্করের আসল পরিচয় পায়নি বলেই খামের উপর 'অমল ঘোষ' নামটা লিখেছে। তবে তোরা ওখানে কী কারণে গিয়েছিস, এতক্ষণে ধরে ফেলেছে সে। তোদের প্রতিটি স্টেপ নজর রাখবে। অ্যালার্ট থাকিস।"

বাবার ফোনের পর যতটুকু সময় পড়ে ছিল, বেডে সোজা হয়ে শুয়ে ইনভেস্টিগেশনটা নিয়ে প্রচুর ভাবল ঝিনুক। এখনও পর্যন্ত কাউকে সাসপেক্টই করা যাচ্ছে না। নতুন-নতুন ইনফরমেশন অ্যাড হয়ে কেসটা আরও জটিল হয়ে উঠছে। দীপকাকু কীভাবে নিশানা স্থির করবেন, কে জানে! পরেশবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে লোকাল থানায় গিয়েছিলেন দীপকাকু। শশাঙ্কবাবুকে গাড়ি সমেত ফেরত পাঠিয়ে দেন। থানার বড়বাবুকে নিজের গোয়েন্দা পরিচয় এবং লালবাজারের রঞ্জনকাকুর রেফারেন্স দিতেই, মাঝবয়সি ও সি সন্দীপ হালদারের তৎপরতা বেড়ে গেল। বলেছিলেন, "বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্য?"

দীপকাকুর রাজুর অ্যাক্সিডেন্টের কথা তুলে জানতে চাইলেন, "যে গাড়িতে ধাক্কা মেরেছিল, তার কোনও হদিশ পাওয়া গিয়েছে কি না?"

ও সি জানালেন, "পাওয়া যায়নি। কোনও আইউইটনেস না থাকার জন্য অসুবিধে হচ্ছে। অত ভোরে, তারপর আবার ঘন কুয়াশা। রাস্তাঘাটে কে থাকবে, বলুন?"

দীপকাকু বলেছিলেন, "কেন! হাইওয়ের ধারে আপনাদের তো সোর্স থাকে সর্বক্ষণ, যে লোক খবর দিতে পারে, কোন গাড়ি, কখন গিয়েছে।"

সন্দীপ হালদার বললেন, "হাইওয়ে ধরে আসা বড় গাড়ি হলে তো কিছু ক্লু পেয়েই যেতাম। ধাক্কা মেরেছে মোটরবাইক। গ্রামের রাস্তা ধরে সবে হয়তো উঠে এসেছিল রোডে। সেক্ষেত্রে সোর্সের চোখে না পড়ার চান্সই বেশি। হাইওয়ে দিয়েও আসতে পারে, ওরকম কুয়াশায় বাইকের মতো ছোট গাড়িকে ঠাহর করা মুশকিল।"

খানিক অবিশ্বাসের গলায় দীপকাকু বলে উঠেছিলেন, "মোটরবাইকে ধাক্কা মেরেছে, আপনারা শিওর?"

ও সি বললেন, "বডি দেখেই আন্দাজ করেছিলাম। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও সেরকমই নির্দেশ করছে। হেড ইনজুরিতে ডেথ। ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে মাথা ঠুকে যায় রাস্তায়।"

এর পর দীপকাকু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। বাইকের ধাক্কাটা সম্ভবত তাঁর অনুমানের মধ্যে ছিল না। এই ফাঁকে সন্দীপ হালদার বলেছিলেন, "আপনার ইনভেস্টিগেশন কী ব্যাপারে, জানতে পারি কী?"

দীপকাকু বললেন, "এখনই না। পরে সবই জানতে পারবেন। এই কেসটা সল্‌ভ করতে আপনার সহযোগিতা লাগবে আমার।"

"অবশ্যই পাবেন। আমার সেল নম্বরটা রাখুন," বলেছিলেন সন্দীপ হালদার। দীপকাকু ওঁর নম্বরটা মোবাইলে সেভ করে, একটা মিস্‌ড কল দিলেন। বলেছিলেন, "বাইকটার ব্যাপারে যদি কোনও খবর থাকে, সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে জানাবেন।"

থানা থেকে বেরিয়ে ঝিনুকরা অটোরিকশা ধরে পৌঁছেছিল হোটেলে, পেল হুমকি-চিঠি। বিকেল চারটে পঁয়তাল্লিশে "রেডি হয়ে নাও," বলে দীপকাকুর ফোন এসেছিল ঝিনুকের রুমে। পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়েছিল ঝিনুকরা। সাইকেল রিকশা নিয়েছিলেন দীপকাকু। ঝিনুকরা গিয়েছিল কোর্ট মোড়ে মোহিতবাবুদের অফিসে। হোটেল থেকে বেরনোর সময় দীপকাকু বলেছিলেন গন্তব্য। উদ্দেশ্য, মোহিতবাবুর ছেলে দিবাকরবাবুকে একবার রিড করা। মানুষটা দু' রকম আচরণ করছেন কেন? আমাদের সঙ্গে যে আচরণটা করছেন, সেটা কি সৌজন্য? ও বাড়িতে আমাদের ঢোকা পছন্দ করছেন না, ঠিক কী কারণে? চোর-ডাকাত পড়ার ভয়টা কি জেনুইন? দীপকাকু কত দূর কী বুঝলেন, কে জানে! ঝিনুক দিবাকরবাবুর সকালের আচরণের সঙ্গে কোনও তফাত করতে পারেনি। যথেষ্ট খাতির করলেন ঝিনুকদের। চা-শিঙাড়া খাওয়ালেন। আবারও আগ্রহ দেখালেন সিনেমায় লগ্নি করার ব্যাপারে।

মোহিতবাবুদের অফিস থেকে বেরিয়ে দীপকাকু নিজেকে শোনানোর মতো করে বললেন, "বাবা বলল বিজনেসের অবস্থা খারাপ। ছেলে বলছে সিনেমায় টাকা ঢালবে। বিষয়টা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। যদিও ফিল্মের গ্ল্যামারাস জগতে এন্ট্রি নেওয়ার ইচ্ছেতে অনেক বিজনেসম্যান ইনভেস্ট করার কথা ভাবে, বেশিরভাগেরই সাধ্য থাকে না।"

দিবাকরবাবুর প্রতি একটু বুঝি উদারতা দেখিয়ে ফেলছিলেন দীপকাকু। ঝিনুক এতটা ছাড় দিতে রাজি নয়। তখনই সে জানিয়েছিল ময়ূরবাড়ির দুই পাহারাদারের কথা, যারা বারবার ক্যামেরার ফ্রেমে চলে আসছিল। সম্ভবত দিবাকরবাবুর নির্দেশেই নজর রাখছিল ঝিনুকদের। ইনফরমেশনটা শোনার পর দীপকাকুর মুখ থেকে শুধু "হুম," শব্দটা বেরিয়েছিল। মানেটা বোঝেনি ঝিনুক। দিবাকরবাবুর দিকে কি ফের সন্দেহের তির ঘুরে এল? কথা বলতে-বলতে একটা চৌমাথায় এসে পৌঁছল ঝিনুকরা। দীপকাকু সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে গেলেন। আঙুল তুলেছিলেন রাস্তার ওপারে তিনতলা বিল্ডিংয়ের দিকে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে তিনটে চালু শোরুম। দোকানগুলোর স্ল্যাবের নীচে সার দিয়ে দাঁড় করানো সাইকেল, মোটরবাইক, দু'টো চারচাকা গাড়ি। ফার্স্ট ফ্লোরে ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিসের সাইনবোর্ড। সেকেন্ড ফ্লোরের সাইনবোর্ডটায় লেখা, 'আইডিয়াল টিউটোরিয়াল হোম'।

ঝিনুক বলে উঠেছিল, "শশাঙ্কবাবুর ছেলে এখানেই পড়ায়। আই ট্রি এইচ।"

মুচকি হেসে দীপকাকু বলে উঠেছিলেন, "ভেরি গুড!"

কিন্তু তারপর যে মিনিট পনেরো-কুড়ি ধরে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে কী দেখলেন, মাথায় ঢুকল না ঝিনুকরে। ওই সময়ের মধ্যে রাস্তার লাগোয়া দোকান থেকে চা খেলেন, সিগারেট শেষ করলেন একটা, নজর সব সময় বাড়িটার উপর। ঝিনুক শুধু এইটুকু বুঝল, শশাঙ্কবাবুর কথাই ঠিক, টিউটোরিয়াল হোমটার নাম আছে। প্রচুর স্টুডেন্টের আনাগোনা দেখা গেল। বাইকে বা সাইকেলে আসছে-যাচ্ছে তারা। গ্রাউন্ড ফ্লোরের দোকানগুলোর সামনে তাই অত গাড়ির ভিড়। ঝিনুক ভেবেছিল, বাইরেটা দেখে নিয়ে দীপকাকু একবার টিউটোরিয়াল হোমের ভিতরে ঢুকবেন। তা না করে সামনে দিয়ে যাওয়া একটা ফাঁকা সাইকেল রিকশাকে দাঁড় করিয়েছিলেন। ঝিনুকরা এখন সেই রিকশায় চেপে চলেছে গির্জা মোড়। জায়গাটা কত দূর কে জানে! চলেছে তো চলেইছে। দূরত্ব দীপকাকুও জানেন না। "লয়্যাল স্টুডিও যাব," বলাতে রিকশাওলাই নিয়ে চলেছে। গির্জা মোড়ের ঠিকানাটা ছাপা আছে স্টুডিয়োর অনভেলপে। এই স্টুডিয়োতেই আসল মুকুটের তিনটে ফোটো প্রিন্ট হয়েছিল। কেন যাওয়া হচ্ছে সেখানে? জিজ্ঞেস করে কোনও উত্তর পায়নি ঝিনুক। দীপকাকু ভীষণ রকম অন্যমনস্ক হয়ে আছেন। খানিক আগের রিকশাওলা খুব কষ্ট করে প্যাডেল মেরে উঁচু ব্রিজ ক্রস করল। নীচ দিয়ে চলে গিয়েছে রেলের লাইন। বোঝা কমাতে দীপকাকু নেমে গিয়ে রিকশার পাশে-পাশে একটু হেঁটেও নিলেন। এখন ঢালু। প্যাডেলিং ছাড়াই নামছে রিকশা। ঠান্ডা হাওয়ায় রীতিমতো কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে ঝিনুকের। পরনে কিন্তু দু'টো জামা। হাফহাতা শার্ট পরা দীপকাকুর কোনও বিকার নেই।

লয়্যাল স্টুডিয়োর সামনে এসে দাঁড়াল রিকশা। কাচ ঢাকা অনেকটা জায়গা। শুধু ফোটো তোলা হয় না। কাচের ওপারে নিজস্ব প্রিন্টিং ল্যাবরেটরিটাও দেখা যাচ্ছে। রিকশার ভাড়া মেটানোর পর দীপকাকু, ঝিনুক পৌঁছল স্টুডিয়োর সেল্‌স কাউন্টারে। দু'টে ছেলের মধ্যে একজন কয়েকজন কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলছে, দ্বিতীয়জন কম্পিউটারে ব্যস্ত। দীপকাকু প্যান্টের পকেট থেকে বের করলেন মোহিতবাবুর থেকে নেওয়া খামটা, কম্পিউটারে কর্মরত ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, "দেখুন তো, এই কাস্টমারকে চেনেন কিনা?"

অতর্কিত প্রশ্নে ছেলেটির মুখে সামান্য বিরক্তি প্রকাশ পেল। তবু এনভেলপটা হাতে নিয়ে চোখ বোলাচ্ছে। ঝিনুক জানে খামটার উপর মোহিতলাল রায়ের নাম লেখা আছে। ছেলেটি বলল, "হ্যাঁ, চিনি। খামটা কি আপনি রাস্তায় বা অন্য কোথাও কুড়িয়ে পেলেন?"

"না। আপনি কি বলতে পারবেন এই জবটা কে ডেলিভারি নিয়ে গিয়েছে?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু। তার সঙ্গে যোগ করলেন, "আমি থানা থেকে আসছি।"

চকিতে দীপকাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে খামের উপর দৃষ্টি নামাল ছেলেটা। বলল, "মোহিতবাবু নিজে আসেননি এটুকু বলতে পারি। এ ধরনের ছোটখাটো কাজে উনি আসেন না। কাকে পাঠিয়েছিলেন মনে করে বলা অসম্ভব। ডেলিভারি হয়েছে এক মাসেরও আগে।"

ঝিনুকও জানে সেটা, খামের উপর ডেলিভারির তারিখটা লেখা আছে। দীপকাকু এবার এনভেলপের যেখানে ছাপার অক্ষরে প্রিন্ট কোয়ান্টিটি লেখাটার পাশে পেনে 'তিন' লেখা আছে, আঙুল রেখে বললেন, "এই লেটারটা কি আপনাদের কারও লেখা? এই কারণে জিজ্ঞেস করছি, পাশেই কিছু একটা লেখা ছিল, গোল করে কেটে দেওয়া আছে।"

কাটা অংশটা ঝিনুকও দেখেছে, সেটাকে 'কারেকশন' হিসেবে ধরেছিল। দীপকাকু এর মধ্যে থেকে কোনও ক্লু পাচ্ছেন। ছেলেটি লেখাটা খুঁটিয়ে দেখে বলল, "এই হ্যান্ডরাইটিং আমাদের কোনও স্টাফের নয়। যে ক'জন কাজ করে সকলের হাতের লেখা আমি চিনি। জব এন্ট্রি, ডেসপ্যাচ সব আমার হাত দিয়ে হয়।"

"খামের উপর তো জব নম্বর আছে, কাইন্ডলি একবার চেক করুন তো ক'টা ফোটো ডেলিভারি হয়েছিল," বললেন দীপকাকু।

"এক্ষুনি দেখছি," বলে ছেলেটি খামের নম্বরটা দেখে নিয়ে কম্পিউটারের কিপ্যাডে আঙুল চালাতে লাগল। থেমে গিয়ে স্ক্রিনে আঙুল রেখে বলল, "এখানে তো চারটে ফোটো ডেলিভারি হয়েছে দেখাচ্ছে!"

মাথা নামিয়ে সাইড থেকে স্ক্রিনটা একবার দেখে নিলেন দীপকাকু। "থ্যাঙ্ক ইউ," বলে ছেলেটার হাত থেকে খামটা নিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "এতক্ষণে বাছাধনকে নাগালে পেলাম!"

ঝিনুকের মাথা পুরো গুলিয়ে গেল। কে বাছাধন? একটা ফোটো মিসিং কেন? অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি কেটে কে লিখল 'তিন'? হুঁশ ফিরতে ঝিনুক দেখল দীপকাকু আশপাশে নেই। তাড়াতাড়ি কাচের দরজা টেনে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। দীপকাকু হনহন করে হেঁটে যাচ্ছেন। সম্ভবত সদ্য পাওয়া সূত্রের উত্তেজনায়। ঝিনুক লম্বা পা ফেলে এগোতে যাবে, পিছন থেকে সজোর ছুটে আসে একটা বাইকের আওয়াজে ঘাড় ফেরায়। সিসি টিভির ফুটেজে দেখা বাইক-আরোহীর মতো হেলমেট, জ্যাকেট। চকিতে মনে হয় বাইকটার লক্ষ্য দীপকাকু। সামনের দিকে স্প্রিন্ট টানতে থাকে ঝিনুক, অনেকদিন প্র্যাকটিসে নেই। যে করে হোক, দীপকাকুকে সেভ করতে হবে। ঝিনুক যখন দীপকাকুর থেকে ফিট চারেক দূরে, বাইকটা ক্রস করে দীপকাকুকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে, শূন্যে জাম্প দিয়ে ডান পায়ের কিকটা বসিয়ে দিল বাইকে বসে থাকা লোকটার কোমরে, নিখুঁত টাইমিং। লোকটা বাইকসুদ্ধ ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। ঝিনুক পপাত ধরণীতল। কাত হয়ে পড়ে থাকা বাইকের চাকা ঘুরে যাচ্ছে। দীপকাকু ছুটছেন লোকটাকে ধরতে। তার আগেই লোকটা বাইক দাঁড় করিয়ে সিটে বসে ধাঁ। শূন্যে এক পা ছুড়ে হতাশা প্রকাশ করলেন দীপকাকু। এবার এগিয়ে আসছেন ঝিনুককে তুলতে। রাস্তায় লোকজন কম থাকলেও, যে ক'জন ছিল তারাও এগিয়ে আসছে ঘটনাটা বুঝতে। নিজে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেল ঝিনুক। অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে পায়ে, বাঁ হাতের কনুইয়ে ভীষণ জ্বালা-জ্বালা করছে। দীপকাকু এসে বাড়িয়ে দিলেন হাত। বললেন, "আবার চোট। কী জবাব দেব বউদিকে?"

কত বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিল ঝিনুক, বাহবার কোনও বালাই নেই! মাকে কী বলবেন, সেটাই এখন প্রধান! দীপকাকুর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে ঝিনুক। ওঁকে মিটিমিটি হাসতে দেখে ভীষণ অবাক হয়, তার পড়ে যাওয়াতে কি মজা পেলেন? ঝিনুকের মুখে অভিমান গাঢ় হওয়ার আগেই দীপকাকু বলে উঠলেন, "শুধু অপরাধী নয়, এই ঘটনা থেকে ইঙ্গিত পাচ্ছি, আমরা চোরাই মুকুটটার থেকেও খুব দূরে নেই।"

"মানে? আসল মুকুটটা এখনও পাচার হয়নি?" বিষম বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চাইল ঝিনুক।

দীপকাকু কোনও উত্তর দিলেন না। পাশ দিয়ে যাওয়া ফাঁকা রিকশাটাকে দাঁড় করালেন।

## ॥ ৮ ॥

মাঝে একটা দিন গেল। ঝিনুকরা এখন চোর এবং মুকুটের কাছে যাওয়ার বদলে খানিকটা দূরে সরে এসেছে। খুব দূরে নয়, আসানসোলের পরের জংশন দুর্গাপুরে। অর্থাৎ কলকাতার দিকে পিছিয়ে গিয়েছে খানিকটা।

আজ সকালে এখানকার এক হোটেলে উঠেছে। ঝিনুক এখনও ভাল করে হাঁটাচলা করতে পারছে না। তবে হাড়গোড় ভাঙেনি। পরশুদিন চোট পেয়েছিল, সেই সন্ধেতেই নার্সিংহোমে গিয়ে ফার্স্টএড, এক্সরে করা হয়েছে। ডাক্তার ইনজেকশন, ওষুধ দিলেন। নার্সিংহোমে থাকার দরকার পড়েনি। রাতে আসানসোলের হোটেলে

ফিরে এসে পরের গোটা দিন-রাত নিজের রুমে বন্দি হয়ে রইল ঝিনুক।

গতকাল দীপকাকু ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফিরলেন রাত ন'টায়। টানা ওই সময়টা ভীষণ বোরিং এবং সন্ধের দিকে অসম্ভব টেনশনে কেটেছিল ঝিনুকের। দীপকাকু বলেই বেরিয়েছিলেন, "ফিরতে রাত হবে। চিন্তা কোরো না।" কিন্তু ফোন তো করতে বারণ করেননি। কী মনে হতে সন্ধে নাগাদ দীপকাকুকে একটা ফোন করেছিল ঝিনুক, 'নট রিচেবল' বলেছিল নম্বর। বার কয়েক ট্রাই করেও যখন পাওয়া গেল না, টেনশনে রীতিমতো ঘামতে শুরু করেছিল ঝিনুক, দীপকাকুর কোনও বিপদ হল না তো?

একবার ভাবছে, হোটেলের ম্যানেজারকে জানাবে। পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল, মোহিতবাবুকে ফোন করে বলে, 'দীপকাকুকে ট্রেস করা যাচ্ছে না। কাল একবার ওঁকে আঘাত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।'

সঙ্গে-সঙ্গে মনে হচ্ছিল, বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। মোটরবাইক অ্যাটাকের ঘটনাটা মোহিতবাবু জানেন কি? দীপকাকু বোধ হয় জানাননি। আগ বাড়িয়ে খবরটা লিক করে দেওয়া উচিত হবে না। খানিক পরেই যদি দীপকাকু ফিরে আসেন, তখন আবার লজ্জার একশেষ। দীপকাকুকে ফোন করতে যাওয়াটাই ভুল হয়েছিল ঝিনুকের। আগের দিনের বাইক অ্যাটাকের ঘটনাটা বলল, নিজের ইনজুরিটা যতটা সম্ভব কম করে বলেছিল। বাবা কিন্তু ধরে ফেললেন। বলেছিলেন, "তোর ইনজুরি যদি সামান্য হত, তুই কি আর সারাদিন রুমে বসে কাটাতিস? কেসের এরকম ক্রিটিক্যাল স্টেজে দীপঙ্করও তোকে সঙ্গে রাখতে চাইত।" এর পর আরও কিছু কথা বলেছিলেন বাবা, ঝিনুকের মাথায় ঢোকেনি। কেস কতটা ক্রিটিক্যাল পজিশনে আছে, বাবা কলকাতায় বসে টের পাচ্ছেন, সে কেন পাচ্ছে না? এই ভেবে দীপকাকুকে ফোন করতে গিয়েছিল। নট রিচেবল কেন? এ ব্যাপারে বাবার সঙ্গেও পরামর্শ করা যাবে না। দুশ্চিন্তা করবেন। হয়তো এখানকার থানাতেই ফোন করে বসলেন। ওরকম দুঃসহ সময়ে শশাঙ্কবাবুর ছেলে অভিজিৎ এসে হাজির। কলকাতায় ফেরার ভলভো বাসের দু'টো টিকিট দিয়ে বলেছিল, "কাল সকালে তো আপনাদের ফেরা। বড়বাবু টিকিট দু'টো পাঠিয়ে দিলেন। অমলবাবুই ওঁকে বলেছেন টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে। তা উনি গেলেন কোথায়?"

এই কেসে দীপকাকুর ছদ্মনামটা প্রায় ভুলতেই বসেছিল ঝিনুক, তাই উত্তর দিতে একটু সময় নেয়। বলেছিল, "মার্কেটের দিকে গিয়েছেন। চলে আসবেন একটু পরেই। আর কিছু বলতে হবে?"

দীপকাকুকে নিয়ে দুশ্চিন্তা অভিজিতের সামনে প্রকাশ করেনি ঝিলিক। অভিজিৎ ঝিনুকের প্রশ্নে মাথা নেড়ে 'না' জানিয়ে চলে যাচ্ছিল। ঝিনুক একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারে না, "উনি কি বাসের টিকিটের কথাই বলেছিলেন মোহিতবাবুকে?" অভিজিৎ বলেছিল, "না, বড়বাবু পরামর্শটা দেন। আপনি তো রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে ভাল মতোই ইনজিওরড হয়েছেন। এখান থেকে স্টেশনে যাওয়া, ট্রেন ধরা, কষ্ট হত আপনার। বাস হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। এখান থেকে উঠবেন, সোজা কলকাতা।"

রিকশা থেকে পড়ে যাওয়ার গল্প পছন্দ হয়নি ঝিনুকের। অন্য কোনও রোমাঞ্চকর ঘটনা বলতে পারতেন দীপকাকু। ঝিনুককে এত আনস্মার্ট না সাজালেও চলত। অভিজিৎ চলে যাওয়ার ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ফিরলেন দীপকাকু। স্বস্তির শ্বাস ফেলার বদলে চমকে উঠেছিল ঝিনুক। এ কী চেহারা হয়েছে! জামা-প্যান্টে ধুলো, কাদা, গাছের পাতা, ঘেঁটে যাওয়া মাথার চুলেও তাই। ঝিনুক বলে উঠেছিল, "কী হয়েছে আপনার? আবার অ্যাক্সিডেন্ট?"

দীপকাকু হাসলেন। বললেন, "একটু মাঠে নেমে কাজ করলাম আর কী।"

মাঠে নেমে কাজ বলতে দীপকাকু সম্ভবত শারীরিক পরিশ্রম বোঝালেন। ফিরে যাচ্ছিলেন নিজের রুমে, ঝিনুক অভিজিতের টিকিট দিয়ে যাওয়ার খবরটা বলে, জানতে চেয়েছিল, "আমরা চলে যাচ্ছি কেন? ইনভেস্টিগেশন কি শেষ?"

দীপকাকু বললেন, "না। যুদ্ধ জেতার জন্য দু' কদম পিছিয়ে যাওয়াও এ ধরনের স্ট্র্যাটেজি।"

ঝিনুক আর কথা বাড়ায়নি। দীপকাকু যখন হেঁয়ালি করে প্রশ্নের উত্তর দেন, বুঝতে হবে আসল কথাটা বলার ইচ্ছে নেই। ডিনার করতে বসে সারাদিন কোথায় ছিলেন, কী-কী করলেন, কিছুই বললেন না। ঝিনুক সাহস করে একবার জানতে চেয়েছিল, "আপনাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না কেন?"

দীপকাকু শুধু বললেন, "তাই নাকি! ফোন তো চালুই ছিল।" ডিনার শেষ করে বলেছিলেন, "লাগেজ প্যাক করে রাখো। বেডটি খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।"

কথামতো হোটেলের সামনে থেকে আরামদায়ক বাসটা ধরা হয়েছিল। খানিকক্ষণের মধ্যেই চোখ লেগে গিয়েছিল ঝিনুকের। দীপকাকু ঠেলে ডেকে তুললেন। বলেছিলেন, "চলো। নামতে হবে।"

ঝিনুক তো অবাক, এত তাড়াতাড়ি কলকাতা চলে এল! নাকি এমন গভীর ঘুম ঘুমিয়েছে, সময় টের পায়নি? বাস থেকে নেমে দেখল দুর্গাপুর। বুঝতে পেরেছিল, কেন দীপকাকু দু' কদম পিছিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কলকাতা তো অনেক কদম দূরে।

এখানকার হোটেলের নাম 'প্যালেস'। আসানসোলের 'ডিউক' হোটেলের মতোই অভিজাত। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ সব এখানেই সারা হল। দীপকাকু নিজের রুমে বসে টিভিতে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টম্যাচ দেখে গেলেন। ঝিনুক ধৈর্য হারিয়ে এক সময় জিজ্ঞেস করে বসেছিল, "আমরা এখানে বসে কোন ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছি?"

দীপকাকু বলেছিলেন, "শিকার জালে পড়ার অপেক্ষা। ফোন এলেই বেরিয়ে পড়তে হবে।"

ফোন এল সন্ধেবেলায়। ঝিনুক তখন নিজের রুমে। দীপকাকু এসে তাড়া দিলেন, "চলো, রেডি হও। ধরা পড়েছে শিকার। ময়ূরবাড়ি যেতে হবে আমাদের।"

হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রাইভেট কার ভাড়া করলেন দীপকাকু। লাগেজ নেওয়া হল না। রাতে হয়তো ফেরত আসা হবে। ঝিনুকরা এখন চলেছে আসানসোলের দিকে। গাড়ির দু' পাশে শুধুই অন্ধকার। মিনিট পনেরো আগে ঝিনুক জিজ্ঞেস করেছিল, "অপরাধী কে? মুকুটটাও কি পাওয়া গিয়েছে?"

দীপকাকু বলেছেন, "ময়ূরবাড়িতে গিয়েই শুনো। নয়তো একই বর্ণনা দু'বার দিতে হবে।"

এতক্ষণে হাইওয়ের দু' ধারে দু'-চারটে বাড়িঘরের আলো চোখে পড়তে শুরু করেছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঝিনুকরা পৌঁছে গেল ময়ূরবাড়ির গেটে। গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দীপকাকু গেটের সামনে দাঁড়ালেন। দু'টো থামের একটায় বাল্‌ব জ্বলছে। আবছায়া সিমেন্টের ময়ূর দু'টোর দিকে তাকিয়ে দীপকাকু বললেন, "এরা আমায় খুব হেল্প করেছে কেসটাতে।"

এমন ভাবে বললেন, ময়ূর দু'টো যেন জ্যান্ত। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন দীপকাকু।

ঝিনুক ভেবেছিল চোর বুঝি এ বাড়িতেই ধরা পড়েছে। দোতলায় মোহিতবাবুর ঘরে ঢুকে যে দু'জনকে দেখল, চোর বলে মানতে ইচ্ছে করছিল না। পুরোহিত পরেশ ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী। বসে আছেন অন্য ঘর থেকে এনে রাখা চেয়ারে। ঝিনুকদের জন্য আগের দু'টো চেয়ার ফাঁকা। মোহিতবাবুও আছেন ঘরে, নিজের পালঙ্কে বসা অবস্থায়। ঝিনুকরা এসে বসল চেয়ারে। দীপকাকুর মুখটা সিরিয়াস দেখাচ্ছে, সম্ভবত অনেক অপ্রিয় কথা বলতে হবে বলে। ঝিনুকও মুখটা গম্ভীর মতো করে নেয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েও কথাগুলো তার অজানা, বুঝতে দিয়ে নিজেকে এঁদের সামনে ছোট করবে কেন? মোহিতবাবু বলে উঠলেন, "চোরটা কে? ধরা পড়ল কীভাবে? মুকুটটা কোথায়?"

"চোরের পরিচয় একটু পরেই পাবেন। পুলিশ চোর, মুকুট একসঙ্গে নিয়ে আসবে। কীভাবে ধরা হল, সেটা আগে বলি," টানা

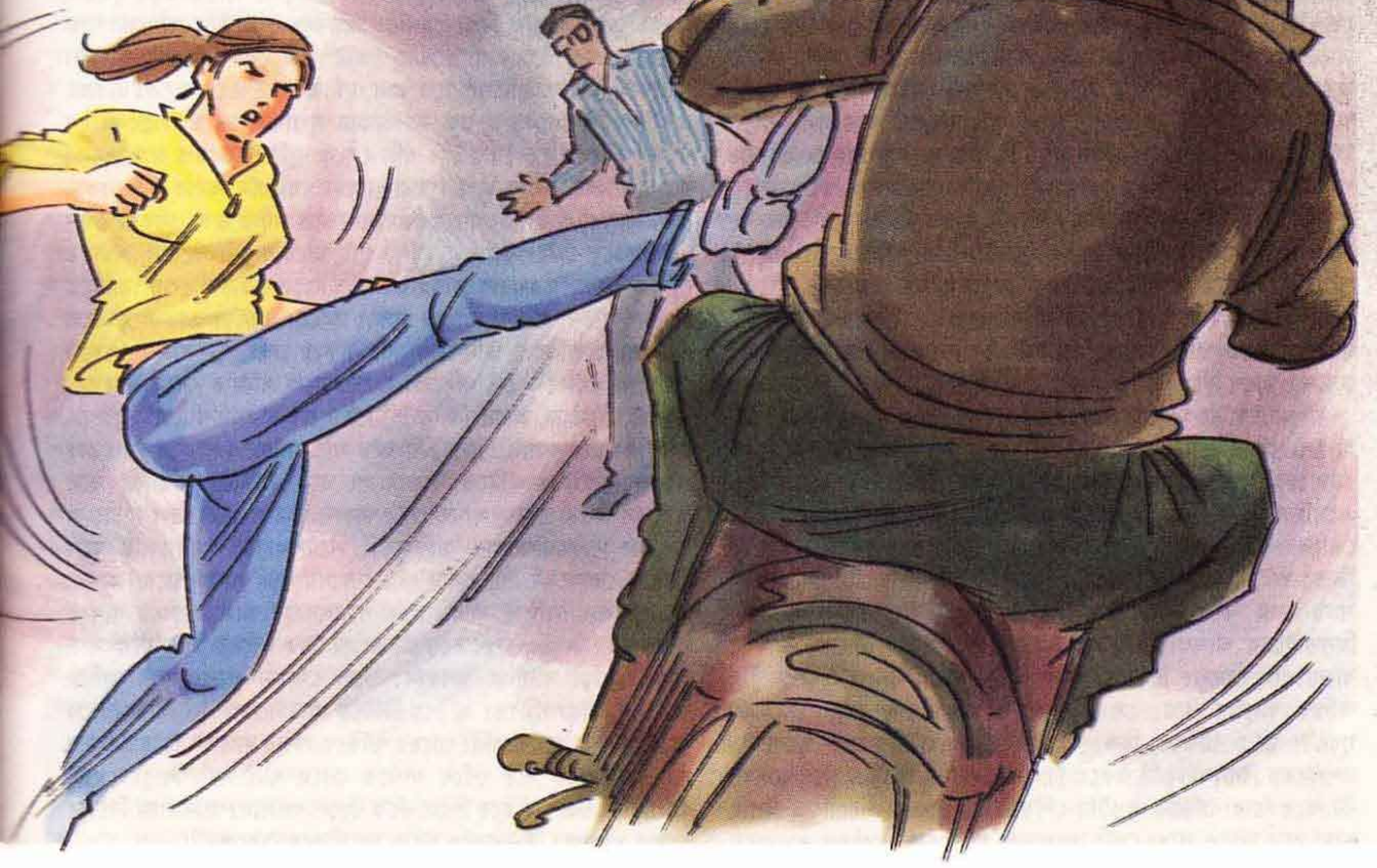

কথা বলার আগে দু'টো খবরই মোহিতবাবুকে দিয়েছেন দীপকাকু। এখানে যে আসছে সেটাও জানিয়েছেন ফোনে। পরেশবাবু এবং ওঁর স্ত্রী কি দীপকাকুর নির্দেশেই এখানে এ ঘরে উপস্থিত?

দীপকাকু বলতে শুরু করলেন, "সত্যি বলতে কী, কেসটা হাতে নেওয়ার সময় আমি আশা করিনি মুকুটটাও উদ্ধার করতে পারব। তদন্ত যত এগিয়েছে, প্রত্যাশা বেড়েছে," একটু পজ দিয়ে ফের বলতে লাগলেন,"এই কেসের সবচেয়ে ইমপর্ট্যান্ট পয়েন্ট হচ্ছে, আসলটা সরিয়ে নকলটা রাখা। নিশ্চয়ই কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল। নকল না রেখে আসল মুকুটটা চোর সরাতে পারত না। বদলের সময় হিসেবে আমি দু'টো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলাম। এক, আপনি ইচ্ছে করলে যে-কোনও সময় এটা করতে পারেন। যেহেতু আসল জিনিসটা আপনার কাছেই আছে। মোটিভ, বিজনেসের হাল ফেরানো। নকলটা দেখে লোকে আসল বলেই মনে করত। কোনও সম্মানহানি হত না আপনার। সন্দেহটা ঠিক দানা বাঁধছিল না। আসলটা আপনি সরালে কিছুতেই নকল মুকুট নিয়ে গোরাচাঁদ স্যাকরার কাছে যেতেন না। তার পেটে কথা থাকে না, আপনি জানেন। সে যে আমাদের কাছে মুকুট বন্ধক রাখার কথাটা বলে দিয়েছে, আমরা জানানোর আগেই আপনি বলে দিয়েছিলেন। তা হলে পরে রইল দ্বিতীয় সম্ভাবনা, ভোগ আরতির সময়। যখন সকলের চোখের আড়ালে থাকে আসল মুকুট। ইতিমধ্যে আমি আপনার দেওয়া সিন্দুকের দোকানের অ্যাড্রেসে ফোন করে জেনে নিয়েছি লকিং নম্বর জানা অথবা সিন্দুকটা ভেঙে ফেলা ছাড়া ওখান থেকে জিনিস সরানোর অন্য কোনও উপায় নেই। তেমনটাই অবশ্য হওয়ার কথা। তবু কোনও ফাঁক যদি থেকে থাকে, তাই ফোনটা করেছিলাম। লকিং নম্বর আপনি ছাড়া কেউ জানে না, সিন্দুকে ভাঙা বা কাটার কোনও চিহ্ন নেই। আরও দু'টো ছোট্ট সুযোগ ছিল জিনিসটা বদল হওয়ার, গোরাচাঁদ স্যাকরার কাছে বন্ধক রাখার জন্য যখন গিয়েছিলেন মুকুটটা নিয়ে আর পাঁচ বছর আগে নিজের ঘরে মুকুট পালিশ করানোর সময়। দু' বারই মুকুটটা আপনি চোখ ছাড়া করেননি। আপনি যে যথেষ্ট সতর্ক এবং বুদ্ধিমান মানুষ, এই ক'দিন আলাপেই টের পেয়েছি এবং ভিডিও ফুটেজে দেখেছি, প্রতিমার মাথা থেকে মুকুটটা খোলার সময় ওজনে হালকা বোধ হলেও, আপনার অভিব্যক্তি ছিল স্বাভাবিক, এতেই আপনার বিচক্ষণতা টের পাওয়া যায়। ফলে আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল ভোগআরতির সময়টা।"

থামলেন দীপকাকু। টানা কথা বলে গলা নিশ্চয়ই শুকিয়ে গিয়েছে, এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে বোধ হয় জল খুঁজলেন। না পেয়ে ফের শুরু করলেন, "ভোগআরতির সময় পুরোহিত মশাই গর্ভগৃহের আলো নিভিয়ে বাইরে এলেন বটে, ভিতরে কেউ ঘাপটি মেরে বসে রইল না তো? এই প্রশ্নটা প্রথম আমার মাথায় এসেছিল। এ ক্ষেত্রে দুষ্কৃতী প্রতিমার পিছনে লুকিয়ে থাকাটা বেছে নেবে। কারণ, আলো নেভানোর আগে পুরোহিত মশাই নিশ্চয়ই দেখে নেবেন গর্ভগৃহে কেউ রইল কিনা। প্রতিমার পিছনটা তাঁর চোখে পড়বে না। তা হলে কে রইল ভিতরে? ভিডিও ক্লিপিংসে দেখলাম ভোগআরতির সময় অনেকেই বাইরে, অনেকেই আবার ফোটোতে নেই। তাদের মধ্যে এক বা একাধিক লোক প্রতিমার পিছনে লুকিয়ে আছে। যারা বাইরে আছে, যেমন আপনি, সম্ভবত সুবর্ণও, কারণ ফোটোটা তখন পাকা

হাতে তোলা হচ্ছিল। কাউকে অবশ্য ক্লিনচিট দেওয়া যাচ্ছে না। বাইরে থাকা মানুষটির নির্দেশেই হয়তো গর্ভগৃহে চুরিটি সংঘটিত হচ্ছে। মন্দিরের ঘরে কোনও জানলা নেই, ঘুলঘুলি বা নালা ভাঙা হয়নি, অর্থাৎ যে ভিতরে ছিল, নকল মুকুট পরিয়ে আসলটা নিয়ে বাইরে আসতে হয়েছে। ভিডিওর ফোটোতে আমরা কাউকে বাইরে আসতে দেখিনি। ভোগআরতির শেষে ভক্তরা যখন গর্ভগৃহে ঢুকছিল, চোর তাদের সঙ্গে মিশে যায়। সে চেনা পরিচিতদের মধ্যেই কেউ, নয়তো ভক্তদের প্রশ্নের মুখে পড়ে যেত। ভাবনা যখন এই পর্যায়ে, জানলাম, অ্যাক্সিডেন্টে রাজুর মৃত্যুর খবর। ঘটনাটা আমার কাকতালীয় বলে মনে হচ্ছিল না। ভোগআরতির সময় ভিডিও ফুটেজে রাজুকে দেখতে পাইনি। তা হলে কি রাজু ভোগ প্রসাদের সঙ্গে ঝোলায় করে আসল মুকুটটা নিয়ে বাড়িতে ফিরেছিল? খবরটা আরও একজন কেউ জানত, যে রাজুকে বাইকের ধাক্কা মেরে মুকুটটা নিয়ে পালিয়েছে। রাজুকে পুরোপুরি মেরে ফেলার উদ্দেশ্য তার ছিল না। থাকলে বাইকের বদলে চার চাকা ব্যবহারে মৃত্যু নিশ্চিত করত সে। কিন্তু জিনিসটা যদি হাতিয়ে নিতে পারে দুষ্কৃতী, তারপরেই পরেশবাবুর বাড়িতে চোর ঢোকার কারণ কী?

"এ ঘটনাটাকেও আমার কো-ইন্সিডেন্ট বলে মানতে অসুবিধে হচ্ছিল। তখন থেকেই আমার মনে হতে শুরু করে, আসল মুকুট আমাদের নাগালের মধ্যে আছে। পরেশবাবুর বাড়িতে সেটাই খুঁজতে এসেছিল অপরাধী। ছিনতাইয়ের আশঙ্কা রাজুও করেছিল, তাই ভোরের ওই নির্জন পথে মুকুটটা নিয়ে বাড়ি ফিরতে চায়নি। মন্দিরের ভিতর-বাইরে কোথাও একটা লুকিয়ে রেখেছিল। পরে সুবিধেমতো সময় বের করে নিত। এখন কথা হচ্ছে, রাজু কেন করেছিল ছিনতাইয়ের আশঙ্কা? ওর চুরির প্ল্যানটা তা হলে কি কেউ জানত, যাকে রাজু চেনে? এখানে এসে আমি দ্বিতীয় একজন অপরাধীর অস্তিত্ব অনুভব করি। সে আন্দাজ করেছিল রাজু মারা গেলেও, মুকুটটা তার বাড়িতে ঠিক পৌঁছে যাবে। সে কারণেই পুরোহিত মশাইয়ের জিনিসটা চুরি করতে ঢুকেছিল সে। রাজু নিয়ে না গেলেও, কী করে তার বাড়িতে মুকুটটা পৌঁছবে? এ ক্ষেত্রে পুরোহিত মশাই ছাড়া আর কারও পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তিনি জেনে অথবা না-জেনে জিনিসটা অন্য পূজাসামগ্রীর সঙ্গে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। চোরের হাত পরেশবাবুর ঝোলায় পড়েছিল। বাসনকোসন চুরি করেছে, সেটা সাধারণ চুরি বোঝানোর জন্য। আসলে খুঁজছিল মুকুটটা। না পেয়ে আলমারি ভাঙে। সেখানেও যে জিনিসটা পায়নি, বুঝতে পারলাম আমাকে হুমকির চিঠি দেওয়া এবং বাইকের ধাক্কা মারার চেষ্টা দেখে। মুকুটটা যদি পেয়ে যেত, আমার অনুসন্ধান নিয়ে মাথা ঘামাত না। অপরাধী বুঝতে পারছিল আমি অচিরেই তাকে শনাক্ত করে ফেলব। মুকুটের লোভ ত্যাগ করে সে চাইছিল না এই শহর ছেড়ে পালাতে। আমাকে ধাক্কা মারতে গিয়েই অপরাধী সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসল। ঝিনুকের দৌড় এবং ক্যারাটের পারদর্শিতার কথা তার জানা ছিল না। অপরাধীর বোঝা উচিত ছিল অ্যাসিস্ট্যান্টকে এখানে আমি বেড়াতে নিয়ে আসিনি। বাইক অপরাধীকে ধরতে না পারলেও, বাইকের নম্বরটা দেখে রেখেছিলাম। এখানকার পুলিশকে নম্বর দিতেই চিহ্নিত হয়ে গেল অপরাধী। এবার আমাকে প্রমাণ করতে হবে তার অপরাধ।"

করিডরে গেট খোলার আওয়াজ। থেমে গিয়েছেন দীপকাকু। কাজের ছেলেটি ট্রেতে সকলের জন্য চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল। দীপকাকুর কথার মাঝে মোহিতবাবু একবার উঠে গিয়ে ইন্টারকমে কিছু একটা বলে এসেছিলেন। বোঝা যাচ্ছে, সেটা ছিল চা পাঠানোর নির্দেশ। দীপকাকু নাম বলার আগে অপরাধীকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে ঝিনুক। চা নিয়ে আসা ছেলেটি যে নয়, বোঝা গেল। কারণ, অপরাধী এখন পুলিশের জিম্মায়। তবে এই নিরীহ কাজের ছেলেটিকে ঝিনুক সন্দেহের তালিকায় রাখেনি। অপরাধী যে যথেষ্ট ধুরন্ধর, দীপকাকুর বর্ণনায় ইতিমধ্যেই তা প্রমাণিত হয়েছে।

কাজের ছেলেটি সকলের হাতে চা দিয়ে চলে যেতেই মোহিতবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কীভাবে মুকুটটার সন্ধান পেলেন?"

কাপে পরপর দু' বার চুমুক মেরে দীপকাকু বলতে শুরু করলেন, "অপরাধীর পরিচয় জানার পর যখন দেখলাম, সে ছিঁচকে চোর বা কয়লা চোর নয়, তখন স্ট্রাইক করল পরেশবাবুর বাড়ি থেকে খনিতে নামার টর্চওলা টুপি, গাঁইতি চুরি হল কেন? এ বাড়ির ময়ূর দু'টোর মৃত্যুর তথ্য আমায় দিশা দেখাতে লাগল। বেআইনি খনিতে পড়ে গিয়েছে তারা, কোথায় পড়েছে কেউ খুঁজে দেখার সাহস করেনি। কারণ, পরিত্যক্ত খনিগুলোতে জল, দূষিত গ্যাস ভরে থাকে। এরকম একটা খনিতে এখনও জল না থাকার সম্ভাবনা আছে, পরেশবাবুর বাড়ির পিছনে যে বেআইনি খনি থেকে পুলিশ কয়েক মাস আগে কয়লা-চোরদের ধরে নিয়ে গিয়েছে। বছর ঘোরেনি, বর্ষার জল থাকার কথা নয় খনিটায়। কয়লার দেওয়াল ভেঙে নদীর জল ঢোকার কেস এই অঞ্চলে নেই। বুঝলাম, টুপি, গাঁইতি চোর চুরি করেনি, খনিতে নামার জন্য পরেশবাবু ব্যবহার করছেন। এককালে কোলিয়ারিতে কাজ করতেন, খনিতে নামার ট্রেনিং আছে। মুকুটটা তাঁর সঙ্গে চলে এসেছে এ বাড়িতে, উনি জিনিসটা লুকিয়ে রেখেছেন বাড়ির পিছনে চোরদের খোঁড়া নতুন খনিতে। মাঝে-মাঝে খনিতে নেমে দ্যাখেন, মুকুটটা ঠিকঠাক আছে কি না। মাঠে বসে চারপাশে চোখ বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন, ফের চুরি হয়ে যাওয়ার চান্স থাকছে না তো? পরেশবাবুর ডাঙাজমিতে যাওয়া বা বসে থাকাকে ওঁর স্ত্রী মনে করতেন সন্তান শোক সামলানোর প্রয়াস। আসলে তা ছিল সন্তানের অপকর্ম লুকিয়ে রাখার ব্যাকুলতা। পরেশবাবুকে গাছতলায় বসে কাঁদতে দেখেছেন স্ত্রী, সেটা ওঁর চোখের ভুল হতে পারে, অথবা ছেলের জন্য সত্যিই কাঁদছিলেন পরেশবাবু। আমার কাছে অবশ্য গাছের তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। গাছটার কাছেই কি কয়েক মাস আগে খোঁড়া খনিটার অবস্থান? চলে গেলাম পরেশবাবুর বাড়ির পিছনের ডাঙাজমিতে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খানচারেক বড় গাছ চোখে পড়ল। একটা পাশে খনি। গাছের গুঁড়িতে দড়ির দাগ স্পষ্ট। তার মানে গাছের গুঁড়িতে দড়ি বেঁধে খনিতে নেমে যান পরেশবাবু। গোটা ব্যাপারটায় নিশ্চিত হয়ে নিয়ে ওঁকে চেপে ধরলাম। জানালাম নিজের আসল পরিচয়। উনি ভেঙে পড়ে সব স্বীকার করলেন।"

থামলেন দীপকাকু। ঝিনুকরে চোখ চলে যায় পরেশবাবুর দিকে, মাথা নিচু করে নিয়েছেন উনি। দীপকাকু ফের বলতে লাগলেন, "পরেশবাবু আমাকে বলেন রাজুর অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুর পরের দিন তিনি নিজের ঝোলায় মুকুটটা দেখতে পান, যে কাপড়ের ঝোলাটা নিয়ে পুজো করতে বের হন তিনি। কাজটা যে রাজুর বুঝতে অসুবিধে হয় না। ছেলেটা তো অপরাধের চরম শাস্তি পেয়েছে, চোর বদনামটা রাজুর নামের সঙ্গে জুড়ে যাক, পরেশবাবু চাননি। তা ছাড়া পরেশবাবু যদি মুকুটটা আপনাকে ফেরত দিতে যেতেন, ভুল বোঝার চান্স থাকত। আপনি ভাবতে পারতেন, বাবা, ছেলে মিলে চুরি করেছে। অ্যাক্সিডেন্টে ছেলের মৃত্যুতে পরেশবাবু ভেঙে পড়ে ফেরত দিতে এসেছেন মুকুট। আপনি হয়তো পরেশবাবুকে তুলে দিতেন পুলিশের হাতে। এই ভেবে পরেশবাবু জিনিসটা এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখেন, যেখানে কারও হাত পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। পরেশবাবুর ইচ্ছে ছিল সামনের বছর পুজোর সময় প্রতিমার মাথায় যে মুকুটটা থাকবে, সেটা সরিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে আসলটা পরিয়ে দেবেন। সাধারণ বুদ্ধিতেই উনি বুঝেছিলেন প্রতিমার মাথা থেকে যে মুকুট আপনি তুলে রেখেছেন, নির্ঘাত নকল। চোর চুরি করলে আসলটাই করবে। নকল মুকুট কোথা থেকে এল, তা নিয়ে আর মাথা ঘামাননি পরেশবাবু। রাজুর অপকর্ম লুকিয়ে রেখে দেন। আমি পরেশবাবুর সঙ্গে গিয়ে খনি থেকে আসল মুকুটটা তোলাই। তারপর গোরাচাঁদ স্যাকরার কাছে গিয়ে সেই অপরাধীর নাম বলি, যাকে আমি চিহ্নিত করে ফেলেছি। গোরাচাঁদবাবুকে নির্দেশ দিই অপরাধীটির কাছে তিনি যেন বলেন, পরেশবাবু তার কাছে এসেছিলেন ময়ূরবাড়ির প্রতিমার মুকুটের দাম কত হতে পারে, জানতে। পরেশবাবুর এক যজমান ওরকম একটা মুকুট গড়াতে চান। এর পর অপরাধীর নাম জানিয়ে

পরেশবাবুকে বলি, আপনি তাকে কলকাতায় যাওয়ার কখন কী ট্রেন আছে জিজ্ঞেস করবেন। অমুক দিন কলকাতায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে, জানিয়ে রাখবেন সেটাও। অমুক দিনটা হচ্ছে আগামী কাল। এদিকে আমি আপনাকে দিয়ে কলকাতায় ফেরার বাসের টিকিট কাটিয়েছি। অভিজিৎ টিকিট দু'টো হোটেলে গিয়ে দিয়ে এসেছে। আমরা আজ কলকাতায় বাসে উঠেও পড়ি। সমস্তটাই নজরে ছিল অপরাধীর। আমাদের চলে যেতে দেখে স্বস্তি পেয়েছিল সে। এর পর আপনাদের মন্দিরে সন্ধ্যাপুজোর জন্য বাড়ি থেকে বেরোলেন পরেশবাবু। আমার নির্দেশে ওঁর স্ত্রীও ঘরে তালা মেরে বেরিয়ে গেলেন পাড়ার হরিমন্দিরে কীর্তন শুনতে। আমার কথাতেই কীর্তনের আসরে কিছুক্ষণ বসে উনি চলে এলেন এ বাড়িতে। পরেশবাবুকেও বলেছিলাম, পুজোর পর আপনার ঘরে আসতে। পরেশবাবুর বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন রেখেছিলাম। লুকিয়ে ছিল তারা। জানতাম, এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না অপরাধী। সে ধরেই নিয়েছে গোপন স্থান থেকে মুকুটটা বের করে রেখেছেন পরেশবাবু। কাল কলকাতায় যাবেন ওটা বিক্রি করতে। আজ সন্ধেবেলা মুকুটটা পাওয়ার জন্য অপরাধী যে পরেশবাবুর ফাঁকা বাড়িতে ঢুকবে, আমি নিশ্চিত ছিলাম। পরেশবাবুকে বলে মুকুটটা রাখিয়েছিলাম আলমারিতে। অপরাধী ঢুকেছে, মুকুট নিয়ে বেরনোর সময় তাকে হাতেনাতে ধরেছে পুলিশ। অপরাধীকে প্রথমে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অফিশিয়াল ফর্ম্যালিটি সেরে এখানে নিয়ে আসবে। এ বাড়িতেও পুলিশের কিছু কাজ আছে।"

থেমে বড় করে শ্বাস নিলেন দীপকাকু। টানা কথা বলার ফলে যথেষ্ট ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। চশমা নেমে এসেছে নাকের ডগায়। ঝিনুক এখন বুঝতে পারছে কাল রাতে দীপকাকু যখন ফিরলেন হোটেলে, কিসের ধুলোময়লা লেগেছিল শরীরে। সত্যিই মাঠে নেমে কাজ করছিলেন। মুকুট উদ্ধারের জন্য ডাঙাজমির বেআইনি খনিতে গিয়েছিলেন পরেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে।

"সবই তো বুঝলাম। কিন্তু নকলটা রাজু কীভাবে তৈরি করল?" জানতে চাইলেন মোহিতবাবু।

দীপকাকু বললেন, "নকল মুকুট রাজু তৈরি করেনি। তৈরি করেছে সে, যে অপরাধীকে আজ ধরেছে পুলিশ। রাজুকে ব্যবহার করা হয়েছিল মুকুটটা বদলানোর জন্য। নকল মুকুট দিয়ে রাজুকে বলা হয়েছিল আসলটা খুলে নিয়ে আসতে। টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাকে। দেওয়া হত না টাকা। অপরাধী ঠিকই করে রেখেছিল রাজু যখন মুকুটটা নিয়ে বাড়ি ফিরবে, বাইকের ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিয়ে মুকুটটা নিয়ে চম্পট দেবে। মাথায় নিশ্চয়ই হেলমেট ছিল অপরাধীর, রাজু যাতে চিনতে না পারে। পরিকল্পনামাফিক ফল হল না। রাজু অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, আরও বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়ল অপরাধী। মুকুটটাও পেল না। পুজোর ভিডিও ক্লিপিংস বারবার দেখে আমি নিশ্চিত হয়েছি, রাজু ভুল করে আসল মুকুটটা বাবার ঝোলায় ঢুকিয়ে ফেলেছিল। রাজুর ভুলেই বেঁচে গেল মুকুটটা। ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে গর্ভগৃহের মেঝেতে পরেশবাবুর ঝোলা এবং রাজুর ঝোলা পাশাপাশি ছিল। দু'টো একই কাপড়ের। গর্ভগৃহের আলো নেভানোর পর রাজু প্রতিমার পিছন থেকে বেরিয়ে নিজের ঝোলা থেকে নকল মুকুটটা বের করলেও, আসলটা ঢোকানোর সময় অন্ধকারে বাবার ঝোলায় ঢুকিয়ে ফেলেছিল। চুরির ব্যাপারে বাবার সঙ্গে রাজুর যে কোনও আঁতাত ছিল না, সেটা পরেশবাবুর কাজ দেখেই প্রমাণ হয়। মুকুটটা যদি হাতানোর প্ল্যান থাকত অনেক আগেই বিক্রি করে দিতে পারতেন। সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন সকলের অলক্ষ্যে প্রতিমার মাথায় পরিয়ে দেওয়ার জন্য।"

থেমে গিয়ে দীপকাকু পকেট থেকে বের করলেন ভাঁজ করা কাগজ। খুললেন কাগজটা, লেজার প্রিন্টে মুকুটের ফোটো। মুকুটের সামনে রাখা একটা ছ' ইঞ্চির ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক স্কেল। স্কেলের বিভিন্ন মার্ক থেকে স্ট্রেট লাইন টানা হয়েছে মুকুটের নানা প্রান্তে, যার মাথায় লাইনটার মাপ লেখা। দীপকাকু ফোটোটা নিয়ে বিছানায় বসা মোহিতবাবুর হাতে দিলেন। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বললেন, "এটা হচ্ছে খাম থেকে মিসিং হওয়া ফোটোর কপি। ফোটোটা তোলার সময় আপাততুচ্ছ কোনও ছুতোয় অপরাধী ছ' ইঞ্চির স্কেলটা মুকুটের সামনে রেখে দেয়। প্রিন্ট হয়ে যাওয়ার পর ফোটোটি খাম থেকে সরিয়ে নিয়ে স্কেলের পারস্পেক্টিভে মুকুটের মাপ বার করে ফেলে। অর্থাৎ মুকুট হাতে না পেলেও নকল বানাতে দিতে অসুবিধে হবে না। দাগ মারা অবস্থায় ফোটোটি কলকাতার এক গয়নার দোকানে দেয় অপরাধী। ডিজাইন বোঝার সুবিধের জন্য ফোটোটা স্ক্যান করে এনলার্জ করেছিল গয়নার দোকান। তারাই আমাকে ছবিটা মেল করেছে। ল্যাপটপ থেকে এটা আমি ডাউনলোড করে নিয়েছি।"

"গয়নার দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কীভাবে?" জিজ্ঞেস করলেন মোহিতবাবু।

"আপনার থেকে যাদের ফোন নম্বর নিয়েছিলাম, পুলিশের হেডকোয়ার্টারে আমার বন্ধু রঞ্জনকে এস এম এস করে দিই। যেদিন স্টুডিও থেকে ফোটো ডেলিভারি হয়েছিল, সেই ডেট থেকে ওই নম্বরের মানুষগুলো কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে জানার জন্য ফোন কোম্পানি থেকে কললিস্ট বের করতে বলেছিলাম। রঞ্জন সেই লিস্ট পাঠিয়ে দেয় আমার ল্যাপটপে। আপনার দেওয়া নম্বরের একজন কলকাতার গয়নার দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল, একই সঙ্গে রাজুর সঙ্গেও ফোনে কথা হত তার। এই ভাবে আমি দ্বিতীয়বার অপরাধীকে চিহ্নিত করি। এবার অনেক প্রমাণসমেত।"

দীপকাকু থামতেই ফোটো থেকে মুখ তুললেন মোহিতবাবু। বললেন, "আমি বোধ হয় আন্দাজ করতে পারছি এ সব কাণ্ড কে ঘটিয়েছে।"

করিডরে গেট খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। এগিয়ে আসছে বেশ কিছু বুটের শব্দ। দরজা দিয়ে ঢুকলেন সন্দীপ হালদার। পিছনে শশাঙ্কবাবুর ছেলে অভিজিৎ, এক হাতে হাতকড়া, অন্য হাতলটা ধরা পাশের কনস্টেবলের হাতে। দীপকাকুর বর্ণনার শেষ দিকে ঝিনুকও অপরাধী হিসেবে অভিজিৎকেই চিহ্নিত করেছিল। মোহিতবাবুর আশপাশে থাকা সবচেয়ে মেধাবি মানুষ সে। অঙ্কে পিএইচ ডি করছে। তবু একটা খটকা লেগে রইল।

ঝিনুকের ভাবনার মাঝে "তুই এত বেইমান!" কথাটুকু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে মোহিতবাবু মারতে যাচ্ছিলেন অভিজিৎকে, দীপকাকু ওঁকে ধরে বিছানায় এনে বসালেন। তারপরই মোহিতবাবু ব্যগ্র গলায় বলে উঠলেন, "আমার মুকুট!"

ও সি সন্দীপ হালদারের হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ। চেন টেনে বের করলেন আসল মুকুট। এগিয়ে গিয়ে মোহিতবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, "দেখে নিন, এটা আপনার কি না। তবে এখনই মুকুটটা আপনাকে দিতে পারব না। কিছু লিগ্যাল প্রোসিডিওরের মাধ্যমে এটা ক্লেম করতে হবে আমাদের কাছে। ল' ইয়ারের সঙ্গে কথা বলুন। যদি আপনার বাড়ি থেকে মুকুটটা পেতাম, তা হলে এখনই দিতে কোনও বাধা ছিল না। জিনিসটা যে সোনার, ইতিমধ্যে আমরা পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছি।"

মোহিতবাবু শান্ত ভাবে মুকুটটা ফেরত দিলেন ও সি-কে। ফোলিও ব্যাগে মুকুটটা ঢুকিয়ে ও সি সন্দীপ হালদার বললেন, "অভিজিৎকে আমরা এখানে নিয়ে এসেছি ওর ঘরটা সার্চ করব বলে। জোরালো এভিডেন্স যদি কিছু পাই, বিশেষ করে মেজারমেন্ট করা অরিজিনাল ফোটোটা, তা হলে গুছিয়ে চার্জশিটটা দিতে পারব।"

এর পর ও সি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দীপকাকুকে বললেন, "চোর ধরার টোটাল ক্রেডিটটা তো আমাদের দিয়ে গেলেন। রাত যা হয়েছে আজ আর নিশ্চয়ই কলকাতায় ফিরবেন না। দুর্গাপুর ফেরার পথে একবার ফোন করবেন প্লিজ। এক সঙ্গে বসে গল্প করতে-করতে কোথাও ডিনার করব।"

"নিশ্চয়ই ফোন করব," সম্মতি জানালেন দীপকাকু।

অভিজিৎকে নিয়ে পুলিশের দল ঘর ছাড়ল। দীপকাকু মোহিতবাবুর

উদ্দেশে বললেন, "মুকুট ফেরত পাওয়ার জন্য উকিলের সঙ্গে কথা বলে যে চিঠি করবেন, দেখবেন তাতে যেন পরেশবাবুর উপর কোনও দায় বা দোষ না এসে পড়ে। উনি এত শোকতাপ সহ্য করেও আপনার মুকুটটা রক্ষা করার চেষ্টা করে গিয়েছেন।"

ডুকরে কেঁদে ওঠার আওয়াজ পাওয়া গেল। পিছন ফেরে ঝিনুক, পরেশবাবু দু' হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছেন। সান্ত্বনা দিচ্ছেন ওঁর স্ত্রী। মোহিতবাবু বললেন, "পরেশকে দায়ী করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আর আপনাকে যে কী বলে..."

কথার মাঝে দীপকাকু বলে উঠলেন, "মুকুটটা এবার থেকে আপনি ব্যাঙ্কের লকারেই রাখুন। পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব একা নেবেন না। জানবেন, বুদ্ধি এমন একটা অদৃশ্য অস্ত্র, যাকে বন্দুক, সিন্দুক দিয়ে রোখা যায় না। বিবেক ছাড়া বুদ্ধি সব সময় ভয়ানক।"

বলার পর দীপকাকু গটগট করে এগিয়ে গেলেন সিন্দুকটার কাছে। চারবার হাত ঘুরিয়ে খুলে ফেললেন ভল্টের দরজা। বন্ধ করে ফের চারবার হাত ঘোরালেন। ব্যাপারটা বাস্তবে ঘটল, নাকি স্বপ্নে? ধাঁধায় পড়ে গিয়েছে ঝিনুক। বিছানায় বসা মোহিতবাবুর দিকে তাকায়। কনুই ভাঁজ হয়ে উনি এখন আধশোওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তের এক্সপ্রেশন মুখ জুড়ে। কোনওরকমে বলে উঠলেন, "আপনি নম্বর জানলেন কী করে?"

দীপকাকু স্মিতহাস্যে বললেন, "আপনাদের ইনশিওরেন্স এজেন্ট বিধানের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম এই কেসের ব্যাপারে এনকোয়ারি করতে। আমার প্রধান জিজ্ঞাস্য ছিল, মুকুটের ফোটো তোলার বুদ্ধিটা কে দিয়েছিল? অভিজিতের নাম করেছিল বিধান। তখনই নানান কথা প্রসঙ্গে জানতে পারি বিধানদের কোম্পানির ক্যালেন্ডার পাওয়ার জন্য আপনি নাকি খুব ছটফট করেন। বছর শেষ হওয়ার অনেক আগে থেকেই তাড়া দিতে থাকেন ওকে। অথচ আপনি আমাদের বলেছেন, বিধান মনে করে বছরের শুরুতেই আপনাকে নতুন ক্যালেন্ডার দেয়। এই তথ্যটা পেয়েই আমার মনে পড়ে আপনি ঝিনুককে বলেছিলেন, নিজের বার্থ ইয়ারের চারটে নম্বর ভল্ট খোলার কোড হিসেবে ব্যবহার করেন না। যে কোড আপনি ব্যবহার করেন, সেটা টাইম টু টাইম বদলেও ফেলেন। এখান থেকেই আমি নতুন ক্যালেন্ডারের প্রতি আপনার ব্যগ্রতার একটা যোগসূত্র দেখতে পাই। প্রত্যেক বছর সাল নির্দিষ্ট চারটে নম্বর আপনার ভল্টের কোড নম্বর হয়ে যায়। যতই বয়স হোক, চোখের সামনে সেই বছরের ক্যালেন্ডার থাকলে কোড আপনি কখনওই ভুলবেন না। এর সঙ্গে ছোট্ট একটা পর্যবেক্ষণ যোগ করি, এই ঘরের সমস্ত কিছুই প্রাচীন, এমনকী ইন্টারম আধুনিক জিনিস হলেও, সেটটা প্রাচীন স্টাইলের। এ সবই আপনার ট্র্যাডিশনাল, অভিজাত রুচির পরিচয়। ক্যালেন্ডারখানা গোড়া থেকেই আমার বড় বেমানান লেগেছে।"

দীপকাকুর হাইট বেশি নয়, মোহিতবাবু এমনভাবে তাকিয়ে আছেন ওঁর দিকে, যেন বিশাল লম্বা কোনও মানুষকে দেখছেন। নীচের তলা থেকে ভেসে আসছে গ্র্যান্ডফাদার ক্লকের ঘণ্টাধ্বনি, রাত আটটা না ন'টা, গুনতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলে ঝিনুক।

সিঁড়ি ধরে দোতলা থেকে নামছে ঝিনুকরা। দীপকাকুর পকেটে মোহিতবাবুর দেওয়া চেক। গাড়িও বলে দিয়েছেন ঝিনুকদের জন্য। দুর্গাপুরের হোটেলে দিয়ে আসবে। অভিজিৎ বিষয়ে যে ধন্দটা রয়ে গিয়েছে ঝিনুকের মনে। এখন জিজ্ঞেস করে দীপকাকুকে, "অভিজিৎ আর বাইক আরোহী কি একই লোক? অভিজিতের নিজস্ব বাইক আছে, এ খবর তো আমাদের কাছে নেই। ওকে বরং একবার সাইকেলে দেখেছিলাম।"

দীপকাকু বলতে লাগলেন, "টিউটোরিয়াল হোমের স্টুডেন্টদের বাইক ব্যবহার করেছে বিভিন্ন সময়। তুমি যে বাইকটায় ধাক্কা মেরেছিলে, নম্বর দেখে নিয়ে আমি আর পুলিশ এক স্টুডেন্টের কাছে পৌঁছই। বাইকটাতে দেখতে পাই সদ্য রাস্তায় ঘষে যাওয়া স্ক্রাচের দাগ।"

বাড়ির নীচে এসে পোর্টিকোর তলায় দাঁড়িয়ে দীপকাকু নিজেকে নিজেরই দু' হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁপুনি লাগা গলায় বললেন, "ওরে বাবা, এখানে তো দারুণ শীত পড়ে গিয়েছে!"

ঝিনুক হাসে, সে তো আসানসোলে এসে থেকে ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে। মনে-মনে দীপকাকুকে বলে, "তদন্ত আপনার কাছে তপস্যার মতো। মুনিঋষিদের কি শীত লাগে হিমালয়ে বসে ধ্যান করতে?"